

সমরেশ মজুমদার

# আমাকে চাই



প্রকাশকাল  
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ ২ মাঘ ১৪০১

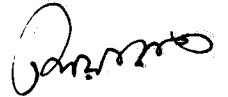
প্রচ্ছদ  
ক্রম এম

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাঙ্গলাবাজার (দায়তলা) ঢাকা ১১০০ থেকে  
মোঃ আলতাফ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালামানি মুদ্রণ  
সংখ্যা ৩৫/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৬০.০০ টাকা

আমাকে চাই উপন্যাসটি প্রথম বেরিয়েছিল আনন্দবাজার  
পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মোহর মফস্বল  
শহরের মেয়ে, মেয়ে হলেও অন্য আর দশটি মেয়ের থেকে আলাদা।  
ছেটবেলা থেকেই সে শার্ট-প্যান্ট পরে আসছে। শুধু শার্ট-প্যান্ট নয়,  
তার সব কিছুতেই ছেলেদের স্বভাব স্পষ্ট। মোহর ভাবে ছেলেরা যা  
পারে মেয়েরা কেন তা পারবে না? ছেলেরা ফুটবল খেলে, ক্রিকেট  
খেলে। সুতরাং মেয়েরাও খেলবে। এই করে সে ফুটবলের একজন  
ভাল গোলকিপার হয়ে গেল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধা  
পাওয়ায় একসময় ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়ে জুডো শিখেছে। জুডো  
প্রতিযোগিতায় দু'দু' রাউন্ড জিতে পরে হেরে গিয়েছে মেয়েদের  
প্রকৃতিগত অসুবিধার জন্য। এখানেই সে কিছুটা উপলব্ধি করতে  
পেরেছে মেয়েদের দুর্বলতা কোথায়। জুডো ছেড়ে কলেজে বন্ধুদের  
আড্ডায় মিলেমিশে তার লেখালেখির ওপর ঝোক চলে আসে। তার  
লেখার বিষয়বস্তু হয় মেয়েদের সমস্যা। লেখার জনপ্রিয়তা বাড়তে  
বাড়তে এক সময় শহর থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময়  
তার ব্যাতি হয় পৃথিবীজোড়া।

উপন্যাসটি আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে অনেকের মনে প্রশ্ন  
জেগেছে মেয়েটি কে? অনেকেই মনে করেন মোহর আর কেউ নয়,  
আমাদের বাংলাদেশের মেয়ে তসলিমা নাসরিন। কথটা কতটুকু সত্য  
তা আমরা বলতে পারছি না। এই উপন্যাস পড়লে পাঠকরাই এর  
জবাব বুঝে পাবেন।



হলুদপুরের নাম কোনও মানচিত্রে নেই। জেলার অন্য অনেক জায়গার নাম মুখে মুখে ধোরে কিছু হলুদপুরের কথা বড় একটা শোনা যায় না। কোনও কলকারখানা নেই, ব্যবসাপাতি বলতে কয়েকটা দোকান, অথচ জায়গাটা নাকি বর্ষিষ্ণু। বেশ বড়সড় কিছু বাড়ি অনেককাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি আর বাগান এবং ছিমছাম রাস্তাঘাট। বাতাসে ধোঁয়া নেই, কর্কশ আওয়াজ বাজে না। এমনকি পূজাপার্বণে মাইকও।

হলুদপুরের মেয়েরা বড় সুন্দরী, তাদের ভাল ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। ওই একটা ব্যাপারে অবশ্য অনেকেই খোঁজ খবর নেয়। ইদনিং বিবাহযোগ্য মেয়ে বলতে আর কেউ নেই। যে আছে তার বয়স মাত্র বারো এবং তাকে দেখলে মেয়ে বলে ভাবাই কঠিন।

হলুদপুরের অন্নদা মুখার্জি শান্তশিষ্ট মানুষ। স্কুলে পড়ান। স্ত্রী পর পর দুটি মৃত সন্তান প্রসব করায় এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী ঢুলু ঢুলু চোখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি চাস?'

'বাবা, আমার বংশ রক্ষা করে দাও। সন্তান পুঁথিবীতে আসছে মৃত হয়ে।'

'ঠিক আছে। হবে। জেলে হবে তোর। আর মেয়ে যদি হয় জেলে সাজিয়ে রাখবি।'

অন্নদা মুখার্জির স্ত্রী বৎসরান্তে কন্যা সন্তান প্রসব করলেন এবং তার শরীরে প্রাণ ছিল। যে মহিলা ধাই-এর কাজ করেছেন তিনি পাঁচজনকে বলে বেড়ান, 'একি মেয়েরে বাবা, শতচেষ্টা করেও কঁাদাতে পারিনি একফোঁটাও।' মেয়েটি বেঁচে গেল। সেই বাঁচা এমন বাঁচা যে হলুদপুরের মানুষজন ভুঁ কৌচকায়।

মেয়ের নাম রাখার সময় অন্নদা মুখার্জির সমস্যা হয়েছিল। সন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুযায়ী কোনও মেয়েলি পোশাক কেনা হয়নি। তবে দুধপোষ্য শিশুদের তো একই পোশাক থাকে। সাতমাসে ভাতের সময় ফ্রকের বদলে শাট এল। ইজেরের বদলে প্যান্ট। একেবারে মেয়েলি নাম না রেখে অন্নদা মুখার্জি রাজশেখর বসুর চলচ্চিত্রকা থিয়েটার নাম রাখলেন মোহর। তাঁর মনে হল এতে চট করে বোঝা যাবে না নারী না পুরুষ।

বারো বছরের মোহরের চালাচলনে নারীত্ব বলতে বাঙালি যা বোঝে তার বিন্দুমাত্র নেই। সে আর পাঁচটা ছেলে যা করে তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয়। তারা যেসব শলাকলি ব্যবহার করে তাতে তার সন্কোচ হয় না। এমনকি স্কুলের মাঠে গোলকিপার হয়ে তার বেলা দেখতে ভিড় জমে যায়। হলুদপুরের একমাত্র স্কুলটিতে ছেলেমেয়ে একসঙ্গেই পড়ে কিন্তু মেয়েরা তাদের জগৎ আলাদা করে নেয় প্রতিটি বছর। মোহর ছেলেদের সঙ্গেই মেশে। তার পরনে হাফ প্যান্ট এবং শাট, মাথার ঢুল ছেলেদের মত ছাঁটা। এ বছর স্কুলের জুনিয়ার ফুটবল দলে সে গোলে খেলেছে ছেলেদের সঙ্গে। তার তরুণরত্নায় হলুদপুর একটাও গোল না খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

মানুষের কান এবং চোখ অভোসে সব মেনে নেয়। মোহরকেও মেনে নিয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন দলীয় কোনও খেলোয়াড় ভুল করলে গোলপোস্টের নীচে দাঁড়ানো মোহর যখন গালাগাল দেয় তখন সেটাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় দর্শকদের। মোহরের হিচ্ছে সে জেলার

জুনিয়র টিমে খেলবে। গোলকিপার হিসেবে এখন তার রেকর্ডই সেরা। কিন্তু গেমস, টিচার শান্তিবাণু মাথা নাড়েন, 'তা হয় না। আমরা স্কুল টিমেই তোকে বেলার্স্টিথ্যানিকটা বেআইনি করে। জেলা টিমে নেওয়া যায় না।'

'কেন না?'

'আফটার অল তুই মেয়ে। টুর্নামেন্টটা ছেলেদের টুর্নামেন্ট। অন্য টিম আপত্তি করবেই।'

'আমি মেয়ে তো কি হল? কোনও ছেলের চেয়ে কি কমতি আছি?'

'আ্যাঁ। তুই আমার সামনে ওসব শব্দ বলবি না।'

'কি সব শব্দ?'

'কমতি আবার কি? কম বলতে অসুবিধে হয়?'

'স্যার, আপনি না—!' খুব হাসল মোহর, 'কম অর কমতির তো একই মানে। যাকগে, আমার বয়সী যে—কোনও ছেলে যা পারে আমি তার চেয়ে ঢের বেশি পারি। তাহলে আমাকে নেবে না কেন?'

'এখন হয়তো পারিস, পরে পারবি না।'

'পরেকার কথা পরে দেখা যাবে।'

হলুদপুর থেকে সেবার তিনজনকে জেলা-দলে নির্বাচিত করা হল এবং অবশ্যই মোহরের নাম নেই। মোহরকে তাভাবার ছেলের অভাব হল না। সে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করল। তিনি চশমা খুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি।'

সামনের বছর থেকে মেয়েরা যা খেলে, এই ধরো ব্যাডমিন্টন, তাই খেলে। ফুটবল খেলো না।'

'কেন?'

'ওটা মেয়েদের খেলা নয়।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'ওই খেলায় গায়ের জোর দরকার হয়। ধাক্কাধাক্কি চলে। তুমি বড় হচ্ছ, এটা ঠিক নয়।'

'আমারও গায়ে জোর আছে। কেউ আমাকে ফাটল করলে আমি হজম হবো না। আর এর সঙ্গে বড় হবার কোনও সম্পর্ক নেই।' মুখের ওপর জবাব দিল মোহর।

অতঃপর হেডমাস্টারমশাই অমদা মবার্জিকে ভেঁকে পাঠালেন। তিনি এই স্কুলেরই শিক্ষক। মোহরের সামনে খুব উদ্ভাবনে তাঁকে সমস্যার কথা বলে বললেন, 'মেয়েকে বোঝান।'

মোহর বলল, 'বাবা, উনি বলছেন, ফুটবল মেয়েদের খেলা নয়। কিন্তু কলকাতায় মেয়েরা ফুটবল খেলে, ইন্টার স্টেট প্রতিযোগিতা হয়। আর আমার দলের কারও চেয়ে আমি খারাপ বোঁ।' এবার অন্তত এগারোটা সিগুর গোল আমি ঘটিয়েছি একথা শাস্তি স্যারই বলেছেন।'

অমদা মবার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন। বারো বছরেই মেয়ে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চিতে পৌঁছে গেছে। যদিও মেয়েদের শারীরিক চিহ্নগুলো ওর শরীরে তেমন প্রকট নয় কিন্তু স্ত্রীর কাছে জেনেছেন মোহরের নারীত্ব এসে গিয়েছে। তিনি এতকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সম্যাসীর কথা মনে রেখে স্ত্রীর আপত্তি শোনেননি। কিন্তু এখন বোধহয় তাঁর মত পাল্টানো উচিত। অমদা মবার্জি বললেন, 'মোহর, আইনে যদি না থাকে তাহলে আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ নেই। সেটাকে মনে নেওয়া ভাল।'

'আইন কোথায় লেখা আছে আমি দেখতে চাই।' গৌজ হয়ে বলল মোহর।

অমদা মবার্জি উম্ম হলেন, 'এভাবে কথা বোলো না। তোমার বাসে এটা মানাচ্ছে না!'

হেডমাস্টার মশাই হাসলেন, 'শোন মোহর। আমরা তোমাকে সন্দেহ করি বলে অনেক কিছু মেনে নিই। এই যেমন ধরো তোমার ইউনিফর্ম। তুমি স্কুলে যেয়েদের পোশাক পরো না তবু তো

কখনও কিছু বলিনি। কিন্তু বাইরের লোক সেকথা শুনবে কেন? আইনের কথা বললে, ওটা আমিও শুনেছি, পড়িনি। তোমার মনে যদি সন্দেহ থাকে তো কাল রবিবার, বাবাকে নিয়ে শহরে চলে যাও। বিখ্যাত ব্যবসারী হরেন রায় মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করো। তিনি জেলা ফুটবলের সভাপতি। সব কিছু জানেন। তিনি যদি রাক্তি হন তাহলে ওর ওপর কথা নেই।'

স্ত্রী তীব্র আপত্তি করলেন। পড়াশুনা শিকয়ে তুলে মেয়ে যাচ্ছে ফুটবল খেলায় তত্ত্বির করতে আর বাবা তাতে ইনক জোগাচ্ছেন! কিন্তু অমদা মবার্জির মনে হল জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে মোহর নিজেরই জানুক কোথায় গমতে হয়। ওর জীবনযাপনের পদ্ধতি ওই নিজে শেখা থেকেই পরিবর্তিত হতে পারে। তাই স্ত্রীর কথা কানে না নিয়ে তিনি পরের দিন শহরের বাস ধরলেন।

বারো বছরের জীবনে মোহর শহরে এসেছে কয়েকবার। পুজোর আগে কেনাকাটা করতেই বেশির ভাগ সময় আসতে হয়েছে। আর একবার কলকাতার বড় টিমের খেলা দেখতে। মোহর আপত্তি সত্ত্বেও আঙ্গ সে স্কিনসের প্যাট আর সার্ট পরে এসেছে। এই প্যাটটার ওপর ওর বেশ ময়া আছে। অমদা মবার্জির এক মাসতুতো ভাই বিদেশ থেকে সম্প্রতি পাঠিয়েছিলেন মোহরের জন্য। কাটছিটাই আলাদা।

হরেন রায়ের বাড়িটি বিশাল। রবিবার বলেই তাঁর বৈঠকখানার ঘরে ভিড় বেশি। জেলার খেলাধুলা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করতে এসেছেন। ঘরের এক কোণে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বৃত্তকে দেখল সে। ফর্সা, গোলগাল, মাথায় টাক, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়ার মত মাপে বুলছে। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ কেবলই মোহরের দিকে চলে আসছিল। মনে মনে মোহর সালা বাঘের ছবি ভাবল। তারপরেই শুয়ারের কথা মনে এল। চর্বিওয়ালা সাদা শুয়ার।

টেবিলের উল্টো দিকে শরীর হালিয়ে বসে হরেন রায় গলা তুললেন, 'এদিকে, ই্যা, এগিয়ে এসো। কি চাই তোমার?'

অমদা মবার্জি শশবৎ মেয়েকে নিয়ে এগোলেন। ভিড়টা একটু আলগা হলে সামনে পৌঁছে তিনি নমস্কার করলেন, 'আজ্ঞে, আমি একজন শিক্ষক। নাম অমদা মবার্জি। হলুদপুরে থাকি।'

'হলুদপুর? ও ই্যা। ওখানে ফুটবল খেলা হয়, তাই তো?'

'আজ্ঞে ছেলেরা খেলেন। তিনজন জেলার জুনিয়র দলে চাম পেয়েছে?'

'ব্যাং। তাদের মন দিয়ে খেলতে বলুন। ভাল খেলতে থাকলে আমার টিমে নিয়ে নেব।' চোখ বন্ধ করলেন হরেনবাবু, 'এটি কে?'

'আজ্ঞে আমার মেয়ে। প্রণাম করো।' অমদা মবার্জি ইশারায় করলেন।

মোটের ইচ্ছে ছিল না। মোহর কি করবে বুঝতে না পেরে শুধু এক পা এগোল। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে হরেন রায় খপ করে তার হাত ধরে বলে উঠলেন, 'থাক, থাক। প্রণাম কেন? তুমি মেয়ে? আঁ? দেখে তো মেয়ে বলে মনেই হয় না। কি বলেন আপনারা?'

সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনসূচক গুঞ্জন উঠল। হরেন রায় আবার চোখ খুললেন, 'আজকাল অবশ্য ছেলেমেয়ের তফাত খুব একটা নেই। মার্টিনাকে দেখে কেউ মেয়ে বলে ভাববে? কি সার্ত। তুমি কি করো?'

'ফুটবল খেলি।'

'ত্যা? ফুটবল? কার সঙ্গে? হাতটা ধরেই ছিলেন হরেনবাবু। মোহর হাতের চেটোয় ওর আঙুলের চাপ অনুভব করছিল। বিচ্ছিন্ন রকমের অনুভূতি।

অমদাবাবু জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে ও আমাদের স্কুল টিমের গোলকিপার। ছেলেদের সঙ্গে খেলো।'

পাশে বসা এক শ্রোট বলে উঠলেন, 'আজ! তুমিই মোহর? বুঝ ভাল খেলা বলে শুনেছি।'  
'তাই নাকি?' হরেন রায় উদ্ভাসিত, 'ভাল খেলে? স্কুল টিমে খেলে? মেয়ে হয়ে?'  
শ্রোট বললেন, 'ওর কথা আমরাও শুনেছি। ওর জনেই হলদুপুর এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে  
একটাও গোল না খেয়ে। শান্তি ওদের গেমটিচার। তাই তো?'

'হ্যাঁ। অমরবাবু মেয়ের প্রশংসায় খুশি হচ্ছিলেন।'  
হরেন রায় মোহরের আরও একটু কাছে টেনে কোমরে হাত রাখলেন, 'এ যে দেখছি দারুণ  
মেয়ে। তা আমার কাছে কি উদ্দেশ্যে আগমন?'

মোহরের অবস্থিতি হচ্ছিল কোমরে। সেটাকে উপেক্ষা করে সে বলল, 'এমন কোনও আইনের  
আছে যে ছেলেরদের টিমে মেয়েরা খেলতে পারবে না?'

'তুমি তো স্কুল টিমের খেলোয়াড়। তোমার আইনে কি দরকার?'

'আমি জেলা টিমে খেলতে চাই। আমার চেয়ে ভাল কোনও জুনিয়র গোলকিপার নেই।'  
হরেনবাবু এবার শ্রোটের দিকে তাকালেন। শ্রোট বললেন, 'কিন্তু মা, আমাদের তো মেয়েদের  
ফুটবল চালু হয়নি। কলকাতায় হয়েছে। আর ডিস্ট্রিক্ট জুনিয়র টিম অবশ্যই বয়েজ টিম। সেখানে  
তো মেয়েদের নেওয়া যায় না।'

'কোন আইন আছে?'

'নামই তো বলে দিচ্ছে বয়েজ টিম।'  
'আমার বয়সী কোনও ছেলে দশটা পেনাল্টি মারলে অস্বস্ত চারটে আমি বিচাৰ। অন্য কোনও  
ছেলে গোলকিপার দাঁড়াক আমি গুনে গুনে দশটাও আটটা গোল দেব। তাহলে আমি ছেলেরদের  
থেকে কম হলাম কিসে?' মোহরের গলায় জেদ স্পষ্ট।

হরেনবাবু মাথা নড়ালেন, 'না। তুমি কম নয়। তবে আমি নিয়ম ভাঙতে পারি না।'  
'নিয়মটা করেছে কে?'

'তা তো জানি না।'  
'আগে স্বামী মরলে বউকে পুড়িয়ে মারার নিয়ম ছিল। এখন কি মানা হয়?'

'হুম। আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে দেখি। তার চেয়ে তুমি যদি কলকাতায় গিয়ে  
মেয়েদের লিগ খেলতে চাও আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কি, মেয়েকে পাঠাবেন?'

হরেনবাবু অমর মুখাৰ্জিকে প্রশ্নটা করলেন। অমর মুখাৰ্জি মুশকিলে পড়লেন। কোনও মতে  
বলতে পারলেন, 'একটু ভেবে দেখি। বাড়িতেও কথা বলা দরকার।'

'ভাবু। ভেবে জানাবেন। আপনাদের মেয়ের ওপর আমার নজর রইল।' হরেন রায় হাত  
সরালেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে মোহর বলল, 'ধৃত, আমি আর ফুটবল খেলব না।'  
অমর মুখাৰ্জি মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর বুঝ খারাপ লাগছিল। একটু সান্ত্বনা দেবার  
ভঙ্গিতেই তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার মাকে রাজি করানো যাবে।'

'কেন?'

'ওই যে, উনি বললেন কলকাতায় পাঠাতে।'  
'না! আমি কলকাতার মেয়েদের দলে খেলব না। তোমাকে কাউকেই রাজি করাতে হবে না।'

অমর মুখাৰ্জি এবং তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন মেয়ে একটা বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে এবং তার ফলে ওর  
জীবনে বড় রকমের পরিবর্তন আসবে। হয়তো ছেলেরি ব্যাপারটা কটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।  
কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটল না। খেলার মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিল মোহর কিন্তু ছেলেরদের সঙ্গে  
আজ্ঞা মারা ছাড়ল না। পোশাক এবং আচরণও এক রইল। শুধু এবার থেকে ঘন ঘন লাইব্রেরি  
থেকে বই আনতে দেখা গেল। এই ব্যাপারটা অমর মুখাৰ্জিকে খুশি করল।

হলদুপুরে এখন বিবাহযোগ্য যুবতী নেই কিন্তু কিশোরী বা বালিকার সংখ্যা কম নয়। এরা  
সবাই মোহরের দিকে অন্যতরো তাকায়। সেই চোখটা তৈরি হয়েছে বাড়িতে মায়েরের কথা শুনে  
শুনে। বারো বছরের মেয়েকে ছেলে শাজিয়ে রাখা তাদের মায়েরা পছন্দ করে না এবং তাই নিয়ে  
প্রায়ই আলোচনা করেন। সেই আলোচনা শেষ হয় একটা আশঙ্কায়, যে কোনও দিন দুর্ঘটনা  
ঘটতে পারে। বলার ধরনে মনে হয় সেরকম কিছু ঘটলে তাঁরা দুঃখিত হবেন না। নিজের  
কিশোরীকে তাঁরা সবসময় সতর্ক করে দেন সমবয়সী বা উচ্চ ক্লাশের ছেলেরদের থেকে দূরে  
থাকতে। তারা কথা বলতে এলে যেন এড়িয়ে চলে এমন নির্দেশ থাকে। মেয়েরাও বুঝে গিয়েছে  
প্রতিটি ছেলেই মনে কুমতলব পুষে রাখছে এবং মেয়েদের ঠাকিয়ে দেবার জন্যে ঘুরঘুর করে। এই  
ঠাকিয়ে দেবার ধরনটা কারও কাছে অস্পষ্ট, কারও কাছে চূড়ান্ত। ফলে কৌতূহল থাকলেও ভয়  
তাদের সামনে পাঁচিল হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে খেলা ছেড়ে দেওয়া মোহর তাদের কাছে অন্য  
ধুমিকা নিয়ে নিল। মোহরের মধ্যে সরকম ছেলেরি আছে। প্যান্ট সার্ট থেকে চুল, হাঁটচালা থেকে  
কথা বলা এমনকি ছেলেরদের মত শালা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারকরায় মোহর এত স্বচ্ছন্দ যে তাকে  
ছেলে বলে ভাবতে কোনও অসুবিধে হয় না মেয়েদের। এবং সে যখন শারীরিক দিক থেকে ছেলে  
নয় তাই তাদের ঠাকিয়ে কিছুই নিয়ে নিতে পারার ক্ষমতা ওর নেই। অতএব এমন একজনের  
সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অভিজ্ঞা কারও কারও মনে তীব্র হল। যেহেতু আর পাঁচটা ছেলের মত  
মোহরের কোনও মেয়ে বন্ধু নেই তাই ওদের মধ্যে কেঁচে কেঁচে সাহসী হা। স্কুল ছুটি পর একটি  
মিনিট চেয়ারার কিশোরী হঠাৎই তার সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি যদি কাউকে না বলা  
তাহলে তোমাকে একটা জিনিস দিতে পারি।'

'কি জিনিস?' মেয়েটার নাম রঞ্জনা, মোহর তেনে এবং জানে এরা তাকে পছন্দ করে না।  
'আগে বলা কাউকে বলবে না।' মেয়েটা হাসছিল আর চারপাশে তাকাচ্ছিল। ওর মুখ লাল।

'বেশ। বলব না।' মোহর সোজা হয়ে দাঁড়াল।  
'থরো।' চট করে একটা ভাঁজ করা কাগজ মোহরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটা দ্রুত উধাও  
হয়ে গেল। মোহর বুঝ অবাক হল। এইসময় ওর দুই ছেলবন্ধু এগিয়ে আসছিল। তাদের  
একজন হেসে বলল, 'তোকে কি দিয়ে পালান রে?'

'তোতে তার কি?' মোহর কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।  
'এমন ভাবে লে যেন প্রেমপত্র লিখে।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'তুই একটা ভিডিও। মোহরকে কেন প্রেমপত্র দেবে?'

মোহর চোখ ছোট করল, 'কেন? আমাকে দিতে দোষ কি?'

দ্বিতীয়জন হাসল, 'দুঃ। মেয়েতে মেয়েতে প্রেম হয় নাকি?'

মোহর মানতে চাইল না। মনে নিলে সে হেরে যাবে, 'হয় না?'

'কক্ষনে না। যে কোনও সিনেমায় দেখবি একজন হিরো আর হিরোইন থাকে। মিঠুন চক্রবর্তী  
বেথা। হিরো নেই, দুজন মেয়ে সিনেমার নায়ক নায়িকা হয় নাকি?'

মোহর একটু নিশ্চয় হল। কথটা সত্যি। সিনেমার পোস্টারে হোমোলিনী আর রেয়ার নাম  
জিতেন্দ্র আর হোমোলিনীর বদলে সে কোনও দিন দেখেনি। এইসময় প্রথম ছোটটি ব্যাক থাক  
করে হেসে উঠল। মোহর রেগে গেল, 'তুই হাসছিল কেন?'

'ক্লাশ টেনের সুভাষা সেদিন আমাকে বলছিল বিদেশে ছেলেরদের সঙ্গে ছেলেরদের প্রেম হয়  
আবার মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের। সেই প্রেমে ব্যাকচাকা হয় না। তারও তাই নাকি? ছোটটি  
কথা শেষ করা মত হাত চালান মোহর। ছোটটির চোয়ালে লাগামার সে গালে হাত দিয়ে বসে  
পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছোটটি তার ওপর ব্যাপিয়ে পড়ল, 'এই মারলি কেন? ততক্ষণে প্রথম  
ছোটটি পা চালিয়েছিল। প্রত্যয় একটা আঘাত লাগল মোহরের কোমরে। এইসময় অন্যছেলেরা ছুটে



আসায় মারামারি খামল। উঠে দাঁড়াতে পারছিল না মোহর। একটা চড়ের বিনিময়ে সে যত আঘাত খেয়েছে তা সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছিল। ভিড় ওদের নিয়ে গেল হেডমাস্টারের ঘরে। তিনিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসছিলেন। মোহরের অবস্থা দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'ইস! তোমার এই অবস্থা হল কেন?' কে মেরেছে?'

দ্বিতীয় ছেলেটি আত্মরক্ষার জন্যে বলে উঠল, 'স্যার! ওই প্রথম হাত চালিয়েছে।'  
'হাত চালিয়েছে! কেন? কেন মারল? কি করছিল তোমরা? লজ্জা করে না ছেলে হয়ে দলবঁধে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলতে। আজ দুজনকেই আমি টিসি দিয়ে দেব।'

'ও স্যার নিজেই কেনে মনে করে না?' প্রথমজন বলল।  
'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। মোহর, কেন তুমি ওকে মেরেছিলে? কি করেছিল?'  
'কিছু করেনি স্যার।' মোহর মাথা নাড়ল।

'কিছু না করলে তুমি কেন ওকে মারতে যাবে? তোমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বোলা।'

'আমি ভুল বুকেছিলাম স্যার।' মোহর গাঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেদুটো খুব অবাক হয়ে মোহরের দিকে তাকিয়েছিল। সম্ভবত নিজস্বের কানকে বিশ্বাস করতো পারছিল না তারা।

'ওহ! হেডমাস্টার মশাইকেও বিচলিত দেখাচ্ছিল, 'তাহলে ওদের বিবুদ্ধে তোমার কোনও অভিযোগ নেই?'

'না। বরং আমিই মাথা গরম করে ওদের প্রথমে মেরেছি।'  
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছেলেটি বলে উঠল, 'স্যার, আমরা খারাপ কথা বলেছিলাম বলে—'  
হেডমাস্টার মশাই মাথার ওপর হাত তুললেন, 'এনাফ! অনেক হয়েছে। আমার সামনে থেকে সবাই বিদায় হও। তবে মনে রেখো এসব আমি কখনও বরদাস্ত করব না। এরকম ঘটনা যদি আর কখনও শুনি তাহলে সবাইকে দূর করে দেব স্কুল থেকে।'

মোহর বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। তার যাওয়া দেখে বাথরুম হেডমাস্টার মশাইয়ের ক্রোধ আর একটু বাড়ল, 'শোন। আমার মনে হচ্ছে তুমি এই হতভাগাদের বাঁচালে। তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। নেত্রটা অ্যানুয়াল পরীক্ষায় প্রত্যেকটা পেপারে তোমার জন্যে পাশ মার্ক হল পঞ্চাশ। তার নিচে পেলে ফেল, প্রমোশন পাবে না। যাও!'

স্কুলের বারান্দা দিয়ে উড়িয়ে উড়িয়ে ইটচিলা মোহর। এখন শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে। পেছন থেকে দৌড়ে এসে দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'এই তুমি আমাদের বাঁচালি কেন?'

'কে তোরের বাঁচিয়েছে?' না তাকিয়ে ইটচিলা মোহর।

'তুই তো।'  
ঘুরে দাঁড়াল মোহর, 'আয় না। একা একা লড়াই দল বঁধে মারপিট করিস লজ্জা করে না।'

প্রথম ছেলেটি চলে এসেছিল কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'হেডস্যারের কাছে চেপে না গিয়ে একখাটা বললেই পারতিস।'

'সেটা তোরা বুঝবি না।' আর দাঁড়াল না মোহর।

স্কুল থেকে বেরিয়ে ইটতে লাগল যতক্ষণ না নদীর ধারে পৌছায়। এখন বিকেল। এদিকে এসময় খুব কম লোক আসে। খোলা আকাশের নিচে সে শুয়ে পড়ল। অনেক রক্তম রং এখন আকাশের দখল নিতে চাইছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল হেডস্যারকে কখনো বলে দিলেই হত। উনি ওদের বকছিলেন দল বঁধে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে বলে। এইজন্যই সে ওদের বাঁচিয়ে দিল। সময়সীমা যে কোনও ছেলের সঙ্গে সে লড়তে পারে। তাহলে তাকে এমন কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে কেন? তাই সে উল্টে কৃপা করল।

উঠে বসল মোহর। না, তাকে আরও গায়ের জোর বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে শিখতে হবে আত্মরক্ষার কায়দাগুলো। ধ্যানদার কথা মনে এল। হলদুপুরে ধ্যানদার একটা আখড়া আছে। জুডো শেখান তিনি। ইউনিফর্ম পরে ছেলেরা তাঁর কাছে ট্রেনিং নেয়। দূর থেকে দেখেছে মোহর, কোনও দিন কাছে যায়নি। আখড়া গেলে কেমন হয়। সে উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে হাতে কাগজটা ঠেকল। সেটা বের করতেই মেয়েটার মুখ মনে এল। রঞ্জনা। ও যদি ওভাবে এই কাগজটা তাকে না দিত তাহলে এমন কাণ্ড ঘটত না। সে কাগজটা খুলল। ওপরে একটা গোলাপ ফুল আঁকার চেষ্টা হয়েছে। তার নিচে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, নইবা তোমার থাকল প্রয়োজন। কি দেব বল তো? কি? কি? কি?'

ব্যাংস এটুকুই। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল মোহর। এর মানে কি? কি দিতে চায় তাকে? প্রেম? ওরা তখন প্রেম নিয়ে তার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসেছিল। মেয়েটার কাছে প্রেম আছে? দেখলে তো মনেই হয় না। মোহরের হঠাৎ একটা খারাপ লাগা তৈরি হল। তার নিজের কাছে তো প্রেম নেই। থাকলে বাখা যেত। সে চিঠিটার দিকে তাকাল। ছেলেরা মেয়েদের প্রেম দেয়, মেয়েরা ছেলেরদের। রঞ্জনা কেন তাকে প্রেম দিতে চাইছে? তাকে কি ও ছেলে ভাবছে? ভাবার কোনও কারণ অবশ্য নেই কারণ হলদুপুরের সবাই জানে সে মেয়ে। মোহর মাথা নাড়ল। তার বাথরুম কোথাও ভুল হচ্ছে। রঞ্জনাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা উচিত সে কি দিতে চাইছে?

ধ্যানদা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে ভাই?'

ভাই। ওকে কি ছেলে ভাবেনে ধ্যানদা? মোহর হাসল। 'পেছন থেকে ইউনিফর্ম পরা একটি ছেলে বলে উঠল, 'ওকে ভাই বলছেন কেন ধ্যানদা, ও মেয়ে।'

'ভাই শব্দটাকে কি আমার সবসময় পুরুষ অর্থে ব্যবহার করি? মেয়েরা তো নিজস্বের মাথা কথা বলার সময় বলেন, না ভাই যান। আসলে ভাই একটা স্নেহসূচক ডাক।' ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শেষ করে ঘুরে গাড়ালেন ধ্যানদা, 'বোলা।'

'আমি জুডো শিখতে চাই।'

'গুড। কিন্তু আমার এখানে কোনও মেয়ে শিক্ষার্থী নেই।'

'তাহলে আমার কিছু এসে যায় না।'

'হঠাৎ তোমার এমন ইচ্ছে হল কেন? তুমি তো ফুটবল খেলা।'

'ফুটবল দলের খেলা। অন্যের ইচ্ছের ওপর খেলা নির্ভর করে।' মোহর সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'তাছাড়া আমি আত্মরক্ষা করা শিখতে চাই।'

'কারণও সঙ্গে মারপিট হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দৃষ্টান্ত একসঙ্গে বাঁপিয়েছিল বলে আমি পারিনি।'

'জুডো শিখলে দুইয়ের বেশি আক্রমণকারীকে সামলাতে পারবে। ঠিক আছে আমি তোমাকে এখানে নেব। কিন্তু মনে রেখো তুমি আত্মরক্ষার জন্যেই জুডো শিখবে।'

মোহর মাথা নাড়ল।

'বেশ। কাল পাঁচটার সময় এসো। আর হ্যাঁ, তোমার বাবা মায়ের আপত্তি নেই তো?'

‘আমি বললে বাবা না বলবেন না।’

ধ্যানদা হাসলেন, ‘খুব ভাল। কাল এসো।’

বাড়িতে ঢোকামাত্র সপাটে চড় পড়ল মোহরের গালে, সেইসঙ্গে চিংকার, ‘কেন মারপিট করেছিস? মেয়ে হয়ে ছেলের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলি কি জন্যে? নিজের বয়স কত হল খোয়াল আছে?’

হেডমাস্টারের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিস কেন? বল বল। আজ তোকে আমি মেরেই ফেলব। ছেলে সেজে ঘোরা ঘোচাচ্ছি আমি।’ চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকতে লাগলেন মা।

‘ঠিক আছে। ছেড়ে দাও।’ অমদা মুখার্জির গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে।

‘তুমি চুপ করো। তোমার আশ্চর্য্যায় মেয়ে এমন দ্বিধা হয়েছ। এরপর বদ ছেলেগুলোর সঙ্গে বসে সিগারেট খাবে। বল, কেন প্রথমে তুই মেরেছিলি?’ মায়ের গলা চিরে যাচ্ছিল।

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল মোহর। গালের জ্বলুনি অথবা চুল টানার যন্ত্রণাকে সে উপেক্ষা করে দাঁতে দাঁত চেপেছিল। তাকে কথা বলতে না দেখে মায়ের রাগ আরও বাড়ছিল।

তিনি মুঠোয় ধরা চুলের গোছসুছু মাথাকে ঝাঁকালেন, ‘বল, কেন মেরেছিলি?’

‘ওরা খারাপ কথা বলেছিল।’ যতটা সম্ভব শান্ত গলায় জবাব দিল মোহর।

‘কি খারাপ কথা?’ মা স্থির হলেন যদিও তাঁর হাত এখনও মোহরের মাথায়।

‘আঃ। ছেড়ে দাও না।’ অমদা মুখার্জি এগিয়ে এলেন।

‘এখন কথা বানাচ্ছে। খারাপ কথা বললে তো হেডমাস্টারের সামনেই বলে দিতে পারত। তোমার মেয়েকে আমার চিনতে বাকি নেই। বল, কি খারাপ কথা বলেছে?’

‘একটা মেয়ে নাকি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে?’ কেটে কেটে বলল মোহর।

সঙ্গে সঙ্গে চুল ছেড়ে দিয়ে নিজের ঠোঁটে হাত নিয়ে গিয়ে শব্দ করলেন মা, ‘কি বললি?’

‘শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল!’

‘কোন মেয়ে তোর সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে?’

আমি জানি না। ওরা রসিকতা করছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছিল কথাগুলো খারাপ।’

‘নিশ্চয়ই খারাপ। খুবই খারাপ।’ অমদা মুখার্জি স্বাধীর দিকে তাকালেন, ‘এসব কথা তোমার স্কুলের ছাত্ররা বলাবলি করে নাকি? মাগো!’ তারপরই মেয়ের দিকে ফিরলেন, ‘কথাটা হেডমাস্টারকে বললি না কেন? তখন কি হয়েছিল?’

‘বলতে আমার লজ্জা করছিল।’

‘লজ্জা করছিল। লজ্জা তো মেয়েদেরই হয়। তার মানে বুঝতে পারছ তুমি মেয়ে বলেই লজ্জা পেয়েছিলে। এখন থেকে আর ছেলের সঙ্গে মিশবে না। কাল থেকে স্ক্যাট পরে স্কুলে যাবে। অনেক বড় হয়ে গেছ তুমি।’

‘অসম্ভব!’

‘আবার মুখে মুখে কথা।’

‘এত ছোট চুলে স্ক্যাট পরলে মেয়েরা আমাকে লুকন বলে ডাকবে।’

‘শুনুন!’

‘শরীরটা বড় আর মাথা ন্যাড়া হয় শুনবেন।’

অমদা মুখার্জি হেসে ফেললেন, ‘ঠিক আছে। আগে ওর চুল বড় হোক তারপর না হয় মেয়েদের পোশাক পরবে। যাও, ভেতরে যাও।’

মোহর গেল না। বলল, ‘বাবা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।’

‘কি কথা?’

‘আমি যতই বলি একটা ছেলের গায়ের জোড় শেষ পর্যন্ত আমার চেয়ে বেশি হবে।’

‘ঠিকই। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু নিয়ম না বদলাতে পারলেও আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে পারি।’

‘কিভাবে?’

‘আত্মরক্ষা করার শিক্ষা নিয়ে। আমি জুড়ো শিখতে চাই।’

‘জুড়ো?’ মা হতভম্ব।

‘হ্যাঁ। আমি আজই ধ্যানদার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। উনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে তোমাদের অনুমতি আছে কি না। কাল যেতে বললেন।’

‘নেই। একদম নেই। একই তো মেয়েলি ব্যাপারগুলো দেখতে পাওয়া যায় না তারপর জুড়ো শিখলে তো কথাই নেই।’ মা বলে উঠলেন।

‘জুড়ো শিখলে কেউ আমার সঙ্গে লাগতে সাহস পাবে না।’

‘কোনও মেয়ে জুড়ো জানে শুনলে পাত্রপক্ষ এগোবে?’

‘পাত্রপক্ষ?’

‘তোমাকে তো বিয়ে দিতে হবে। জুড়ো শিখলে কেউ ধারে কাছে বৈসবে না।’

‘মা তুমি বুঝবে না। বাবা, তুমি বলো।’

অমদা মুখার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন। এককথায় ফুটবল ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটা যা তাঁর স্ত্রী হাজার বার বলেও ছাড়তে পারেন না। স্কুলের মারপিটের কথা পরে তিনি জেনেছেন। জেনে বিবর্ত যেমন হয়েছিলেন রেগেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাগ প্রকাশ করার সুযোগ পাননি ওর মা সোটা করায়। নিজে রাগ করে করে যা করা যায় অন্যকে সেই ভূমিকায় দেখলে তা আর করা যায় না। হেডমাস্টারমহাশয় অবশ্য তাঁকে বললেন, ‘তবু আমি মেয়েটির প্রশংসা করব।’ উনি এখন পর্যন্ত কথাটাকে মনে নিতে পারছিলেন না। বললেন, ‘এ বছর তোমার পাশমার্ফ পঞ্চাশ। প্রমোশন পেতে গেলে অন্য দিকে মন দেওয়া চলবে না।’

‘আমি তো কখনই নাটের নীচে পাই নে। কিন্তু আমাকে আত্মরক্ষা করতে শেখাও। তোমরা তো সবসময় আমাকে ঝাঁকতে পারবে না। পাঁচটা ঝুঁকে ছাটো। তুমি আমার কথা রাখবে না?’

‘ঠিক আছে। শিখে দ্যাখো কত দিন ভাল লাগে!’ অমদা মুখার্জি না বলে পারলেন না।

মোহর হাসল, ‘ধ্যানদা ইউ বাবা। ধ্যানদাকে বলে এসেছিলাম আমি বললে তুমি না বলবে না।’

একটা মেয়ে ভাল ফুটবল খেলে, বুটের ওপর ঝাঁপিয়ে বল ছোঁ মেরে তুলে নেয়, ভয়ভর কম কিন্তু জুড়ো শুধু সাহস থাকলেই শেখা যাবে না, শরীরটাকেও চাবুকের মত চালাতে হবে। হুদদপুরের জুড়ো শিক্ষার্থীদের মনে হয়েছিল মোহর প্রথম দিনেই কেটে পড়বে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটল না।

ধ্যানদাও অবাক হয়ে গেলেন। যা শেখাচ্ছেন তা রপ্ত করতে অন্যদের চেয়ে অনেক কম সময় নিচ্ছে মোহর। এক্সারসাইজ করার সময় কখনও বলছে না সে ক্লান্ত। খুব দ্রুত সে সিনিয়র ছাত্রদের কাছাকাছি উঠে আসছে। তাকে বলেই ধ্যানদা যা কিছু অনুশীলন মোহর করে নিজে তার সঙ্গী হন। অন্য ছেলেরের ওর সঙ্গে দেন না। শুধু জেদ আর নিষ্ঠা মেয়েটাকে আলাদা করে তুলছে বলে ধ্যানদার ধারণা। এখন তিনি ছাত্র শব্দটিকে উভয়লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। এমন ছাত্র পেলে যে কোনও শিক্ষকের উৎসাহ বাড়বে।

মোহর জুড়ো শিখতে এই খবর হুদদপুরের সবাই জেনে গেল। স্কুলের যেসব ছেলেরা ওকে মেয়ে ভাবতে চাইত তারা উদাসীন হল। যাদের সঙ্গে মারপিট হয়েছিল তারা এড়িয়ে যেতে লাগল। আর উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকতে লাগল, কেউ আঁখি ঘাটাইল না।

টিফিনের সময় মোহরের মনে পড়ল রঞ্জনার কথা। অনেক দিন হয়ে গেল চিঠিটা সে পেয়েছে কিন্তু তারপর আর ওর সঙ্গে কথা হয়নি। হয়তো সেই মারপিটের কথা জানার পর রঞ্জনা তাকে এড়িয়ে চলেছে। চিঠিতে ও যা দিতে চেয়েছিল তা নিয়ে আর উভব্যতা করছে না। সে মেয়েদের দম্ভলে দাঁড়ানো রঞ্জনার দিকে এগিয়ে গেল, 'রঞ্জনা!'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কেউ কেউ ঠোট টিপে হাসতে লাগল, বাকিরা গম্ভীর মুখে অন্যদের দিকে তাকাল। একজন বলল, 'এই রঞ্জনা, তোকে ডাকছে।'

রঞ্জনা যেন বিরক্ত এমন ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার?'

'তোরা চিঠিটা।'

হঠাৎ গলা নামাল রঞ্জনা, 'এখানে না। বিকেলে বাড়িতে এসো।'

'বিকলে আমার ভূতো ক্লাশ আছে।'

রঞ্জনা দাঁড়াল না। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের কিছু বলতেই তারা শব্দ করে হেসে উঠল। ক্লাশে ফিরে এল মোহর। এখন সে ইচ্ছে করলে স্কুলের মাঠে গিয়ে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটাই করছিল না। নন্দিনী মনে একটা মেয়ে বসেছিল ক্লাশে, বসে বই পড়ছিল। কাগজে গিয়ে মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'কি পড়ছিল রে?'

নন্দিনী দেখাল বইটা। বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়। বইটা ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে মোহর। চোখ বড় করে বলল, 'দারুণ!'

'ফ্যান্টা।'

'ফ্যান্টা মানে?' ছোটখাটো রোগা চশমাধারী মেয়ে নন্দিনীর চোখে বিস্ময়।

'ওঃ ফ্যান্টা মানে ফ্যান্টাস্টিক। তুই কালো ভ্রমর পড়েছিস?'

'না। তুই গল্পের বই পড়িস?' নন্দিনী যেন খুব অবাক হয়ে গেছে।

'কেন? আমি কি পড়তে পারি না?'

'না। মাথা নেড়েছিল নন্দিনী, 'আমি তা বলছি না। আসলে তুই তো ছেলেদের মত শেলাধুলো করিস, বই পড়ার সময় হয়তো পাস না, এরকম ভেবেছিলাম।'

'তার মানে ছেলেরা গল্পের বই পড়ে না?'

'আমার দাদা তো পড়ে না। বলে সময় নেই। দাদার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগে।'

ধ্যাদার আখ্যায় এগে মোহর জানতে পারল একজন শিক্ষার্থীর আকস্মিক হয়েছ বলে তাকে নিয়ে তিনি হাসপাতালে গিয়েছেন। সবাই প্রশ্নে কি ভুল করেছে তা নিয়ে আলোচনা করছিল। প্রশ্নের নামের ছোট্ট একা এই অনুশীলন করছিল। ছেলটার বয়স অন্তত তুড়ি হবে। খুব চোয়ালে দেখতে। গায়ে যে জোরা আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। এখানে ওর কোনও বন্ধু আছে বলে মনে হয় না। ওকে কারও সঙ্গে গল্প করতে দ্যাখনি মোহর। প্রশ্নেও দেখলেই মোহর অদ্ভুত রকমের আকর্ষণ বোধ করে। প্রশ্নের শরীর, বেশরোয়া ভাব এবং গুজুতাই হয়তো সেই আকর্ষণ তৈরি হতে সাহায্য করেছিল। সেই প্রশ্নে আজ একা একা অনুশীলন করতে গিয়ে এমন বেকায়দায় পড়ে গেছে যে হাড় ভেঙে মাথায় আত্মাভাবিক নয়।

মোহরের খারাপ লাগছিল। একজন তাকে অনুশীলন করবে একথা জিজ্ঞাসা করায় সে মাথা নেড়ে না বলে ইটতে শুরু করল। 'পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়। কোনও কিছুই কারণে জন্মে থাকে না। যে কাজ তোমার করার কথা, সেটাই মনে দিয়ে করে যাক, কোনও অজুহাতে মদি-ফত-সরিয়ে না নাও তাহলেই সাক্ষ্য পাবে।' কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করে নেয়। তার মনে এখনই ফিরে গিয়ে তার অনুশীলন করা উচিত। একজনকে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলে সে কেন ফাঁকি দেবে? এটা তো একটা অজুহাত। মোহর ফিরে এল। পোশাক পাশ্বে অনুশীলনে নামল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মগ্ন হয়ে গেল মোহর। ধ্যাদার দেখিয়ে দেওয়া

মুভসেন্টগুলো একের পর এক শেষ করে মনে হল শরীরটা সহজ হয়েছে। আজকাল বিকেলে অনুশীলন না করলে মনে হয় কি যেন বাকি থেকে গেল। আর তখন কিছুতেই স্থগিত হয় না।

এখন দেখিতে সন্ধে হয়। অল্পদা মুখার্জি তাকে বলেছেন যেখানেই যাও সন্দের অন্ধকার নামার আগেই বাড়িতে ফিরবে। এখন বাড়িতে ফিরে স্নান না করলে কিছুই ভাল লাগবে না। জোরে জোরে ইটছিল। এখনও মাথার ওপর বোদ। শীত আর গ্রীষ্মের মধ্যে কি ফারাক।

হঠাৎ মুখ তুলতে সে রঞ্জনাকে দেখতে পেল। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। মোহর দাঁড়াল। রঞ্জনাঘরের বাড়িটা দোতলা। অবস্থা বেশ ভাল। সে ইতিমধ্যেই একটা এগিয়ে যেতে দুজন মানুষকে দেখতে পেল। বয়স্ক দুই নারী পুরুষ বারান্দার চেয়ারে বসে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে বেশ বিস্ময় ওঁদের চোখে।

'তুমি?' মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার নাম মোহর। রঞ্জনার সঙ্গে পড়ি।'

'ও, তুমিই মোহর। তুমি তো ফুটবল খেলতে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন খেলা না?' মহিলা যেন অসীম কৌতুহল।

'না।' মোহর ভেতরের দিকে তাকাল কিন্তু রঞ্জনাকে দেখতে পেল না। অথচ রঞ্জনাই তাকে ডেকেছে।

এবার পুরুষটি বললেন, 'তোমার কথা আমি শুনেছি। খেলাও দেখছি। তোমাকে দেখে কে বলবে তুমি মেয়ে। এখন তোমার উচিত নিজেকে চেনে করা। অবশ্য তোমার বাবা মা ভাল বুঝবেন।'

মহিলা বললেন, 'রঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? যাও, ও ভেতরেই আছে।'

মোহর ভেতরে ঢুকল। চারপাশে সাঙ্খ্যের চিহ্ন ছড়ানো। এই সময় সে রঞ্জনাকে দেখল।

আর একটা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল সে।

মোহর বলল, 'কি বলবে বলে। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, সন্ধে হয়ে এসেছে।'

'মোটের। না। এখনও দেরি আছে। আমার ঘরে চলে।' রঞ্জনা ইটতে লাগল। ওকে অনুসরণ করে দেওলায় চলে এল মোহর। একতলায় একজন কাজের লোক নজরে এসেছিল। দোতলা ফাকা, রঞ্জনার ঘরটা সুন্দর। জানলায় রঙিন পর্দা টাটা। সে বলল, 'বসো।'

মোহর বলল। রঞ্জনা আবার হাসল, 'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।'

'আমাকে? সারা শরীরে ঘাম। ঠাট্টা করছ?'

'মোটের। না। ঘাম বলেই ঠিক ছেলে ছেলে মনে হচ্ছে। অবশ্য ছেলে হলে মা বাবা তোমাকে ভেতরে ঢুকতেই দিত না। আমার বয়ে গেছে সত্যিকারের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে।' রঞ্জনা হাসল। মোহরের মনে হল ক্লাশের যে রঞ্জনাকে সে দ্যাখে তার সঙ্গে এখনকার রঞ্জনার কোনও মিল নেই। নীলচে স্ফটিক পরা এই রঞ্জনা অনেক পুতুল পুতুল। মুখচোখে গোলাপি আভা।

মোহর বলল, 'কি বলবে বলে।'

'আমি তোমাকে চিঠি লিখেছি বলে শ্যামলায়া খুব রেগে গিয়েছিল? তোমাকে মেরেছিল?'

মোহর মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলল না।

'কি জেলাস। তুমি কি চিঠিটা দেখিয়েছ?'

'না। কিন্তু চিঠির মানে কি?'

রঞ্জনা জবাব না দিয়ে চট করে পর্দা সরিয়ে বইরটা দেখে নিল। তারপর নিঃশ্বাস চেপে

বলল, 'তুমি বোঝনি।'

'না।'



‘তুমি একটা যাচ্ছেতাই। হঠাৎ কাছে ছুটে এল রঞ্জনা। বসে থাকা মোহরের মাথাটা বুকে চেপে ধরে বলল ফিসফিস করে, ‘আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ।’

বুকে গাল চেপে থাকায় অস্বস্তি যেমন হিচ্ছিল তেমনি আর এক ধরনের নরম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হল মোহর। সে অনুভব করল রঞ্জনার শরীর তার চেয়ে অনেক বাতস্ত। কোনমতে মাথা নামিয়ে সে বলল, ‘এই কি হচ্ছে?’

একটু সরে দাঁড়াল রঞ্জনা, ‘আমাকে তোমার ভাল লাগে না?’

মোহর তাকিয়ে থাকল। রঞ্জনা গাঢ় গলায় বলল, ‘আমি কি দেখতে খারাপ?’

‘না। তুমি তো সুন্দরী।’

‘তাহলে? তোমাকে আমার ভাল লাগে, আমাকে তোমার ভাল লাগবে না কেন?’

‘আমি কি বলেছি খারাপ লাগে?’

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে অদ্ভুত উল্লাসের শব্দ উচ্চারণ করল রঞ্জনা। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, ‘তাহলে কথা দাও আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না?’

‘বাঃ। এরকম কথা কি করে দেব? আমি তো বাবাকে খুব ভালবাসি।’

‘ওঃ। বাবা মায়ের কথা বলছি না। অন্য কোনও মেয়েকে—।’

‘বেশ!’

‘স্কুলে কিন্তু আমরা কথা বলব না। কেউ জানতে পারবে না আমাদের কথা। শুধু সপ্তাহে তিন দিন তুমি এ সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। না, তিন নয়, চার দিন। প্রমিশ?’

‘শীতকালে পারব না। সন্ধে হয়ে যাবে।’

‘শীতকাল অনেক দেরি আছে। উঃ, আমার আজ কি ভাল লাগছে। এই, তোমার কি এটা ফাস্ট লাভ?’

মোহর আচ্ছন্নের মত বলল, ‘হ্যাঁ।’

রঞ্জনা পায়ে পায়ে কাছে এল। তারপর বলল, ‘তুমি কি?’

‘কেন?’

‘আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নিছ না কেন?’

মোহরের মনে পড়ে গেল চিঠিটার কথা। সে বলল, ‘জিনিসটা কি তাই বুঝলাম না।’

‘তোমাকে নিয়ে আর পারি না। দাঁড়াও।’ রঞ্জনা দৌড়ে চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। পছন্দ করে একটা লিপস্টিক তুলে নিয়ে পাশের বাথরুম ঢুক গেল। হঠাৎ মোহরের মনে হল সে নেন সন্ধ্যা আর মেয়ে নয়, ছেলে হয়ে গিয়েছে। রূপকথার রাজকুমার হয়ে নীলবরনা রাজকন্যার কাছে এসেছে। সে মেয়ে বলে কেউ এখানে অনুকম্পা করার জন্যে বসে নেই।

রঞ্জনা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। মোহর দেখল ও মুখ ধুয়ে ফেলেছে। লিপস্টিক রেখ দিয়ে ও একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল, ‘রাতে ঘুমাবার আগে খুলে দেখবে।’

‘কি আছে এতে?’

‘বললাম তো। ধরো এতে যোল আছে। খুশি?’

কাগজের ভাঁজ খুলতে ইচ্ছে হলেও সেটাকে পকেটে ঢোকাল মোহর। তারপর বলল, ‘যাই।’

‘যাই বলতে নেই, আসি বোলা।’

মোহর হেসে বলল, ‘আসি।’

নীচে রঞ্জনার বা এখব বাবা বসেছিলেন একইভাবে। মোহরকে চলে যেতে দেখে রঞ্জনার বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘লান্ট পড়াকায় তোমার পার্সেন্টেজ কি রকম ছিল?’

‘সিরটি ফাইন্ড।’

‘বাঃ ভাল। তবে আরও বাড়ানো দরকার। রঞ্জনার সঙ্গে পড়াশুনা নিয়ে কথা বললে?’

‘হ্যাঁ।’



মাঝে মাঝে এসে। আলোচনা করলে দুজনই উপকৃত হবে।’

তখন অঙ্কার নামাব নামব করছে। মোহর দৌড়াতে লাগল। সময়কে হারাতে সে মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছিল। ইদানীং অনুশীলনে থাকায় তার শরীর এখন অনেক হালকা হয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই সে নিজের নামটা শুনতে পেল। ও মুখ ফিরিয়ে দেখল শান্তিবাবু, ওদের পেয়াটিকার আর অম্মদা মুখার্জি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। অতএব দাঁড়াতে হল। অম্মদা মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওভাবে ছুটছেন কেন?’

‘সন্ধে হয়ে গেছে।’ মাথা নামাল মোহর।

‘ও! ওটা একটা আগে খোলা করলে এভাবে দৌড়াতে হয় না।’ অম্মদা মুখার্জি শান্তিবাবুর দিকে তাকালেন, ‘শুনেনি একটা লোক পেছনে বাধ দেখে এমন গতিতে দৌড়েছিল যা কার্ল লুইস কোনও দিন পারেনি। আমার মেয়ের সেই দশা। সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফেরার কথা, বেহেতু হনুমানের মত সৃষ্টিকে বগলে আটকে রাখতে পারিনি তাই ওভাবে দৌড়াচ্ছে।’

শান্তিবাবু বললেন, ‘কিন্তু খুব ভাল। স্টেপিণ্টা সামান্য ঠিক করে দিতে পারলে ও চ্যাম্পিয়ান হবেই। হ্যাঁয়ে, তুই লম্বা হয়েছি মনে হচ্ছে?’

অম্মদা মুখার্জি বললেন, ‘হ্যাঁ, জুড়োর ক্লাশে ভর্তি হবার পর চ্যাম্পা হয়েছেন।’

শান্তিবাবু বললেন, ‘কাল স্কুল ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবি?’

ঘাড় নেড়ে হীরে হীরে বাড়িতে ফিরে গেল মোহর।

মোহরের এখন নিজস্ব ঘর হয়েছে। দেওয়াল জুড়ে অনেকের পোস্টার সঁটা। সবচেয়ে বড় পোস্টার ছিল লেভ ইয়াসিনের। সেই জায়গাটা এখন খালি। পেলে মারাদোনো থেকে মাইকেল জ্যাকসন এখনও ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকেন সারাক্ষণ। রাতে বাওয়াদাওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে কাগজটা খুলল। খুলে অবাক সে।

ঠিক মাঝখানে লাল লিপস্টিক দিয়ে তোলা টোন্টের ছাপ। নিটোল দুটো কমলালেবুর কোয়ার মত। তলার লিপস্টিক দিয়ে লেখা ‘টেক টু।’

অদ্ভুত আচ্ছন্ন হয়ে গেল মোহর। তাহলে এটাই দিতে চেয়েছিল রঞ্জনা? দুটো টোন্টের ছবি? চিনিতেন অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছিল শিরায় শিরায়। রঞ্জনাকে খুব ভাল লাগছিল এখন। তার নিজের কাগজও ভাই বোন নেই যে তাদের দুহাতে জড়িয়ে আদর করতে পারে। মা বাবা এখন যেন অনেকটা দূরে। এই মুহুর্তে ওর ইচ্ছে করছিল রঞ্জনাকে আদর করতে।

একটা জ্বর জ্বর ভাব, বুকের ভেতর উখাল পাখাল, বিকেল হলেই রঞ্জনার বাড়ির তীর আকর্ষণ যেন কদিন ধরে আচ্ছন্ন করে রাখল মোহরকে। তার মনে হতে লাগল রঞ্জনা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনও আপনজন নেই। রঞ্জনার ওপরের ঘরে পৌছানো মাত্র সে অসাড় হয়ে যায়। কাছে গিয়ে কেউ না থাকলে, রঞ্জনা যখন তাকে আদর করে তখন ঘরে বাওয়াদাওয়া ইচ্ছে জাগে। কি সুখ, কি সুখ। একটা কথা সে কাউকে বলতে পারবে না যে তার চেয়ে অনেক বেশি রঞ্জনা জানে। রঞ্জনা নাকি ওসব বই পড়ে শিখেছে। ওদের বাড়িতে ছোটদের বই পড়া নিয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। ওর ঘরেই শরৎসেনের গ্রন্থাবলি আছে। তার একটা পাতা খুলে পড়েছিল রঞ্জনা। কিরণময়ী দিবাকরের শীতল ওস্তে চুপন করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল। রঞ্জনা গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ‘বলো তো, শীতল ওস্তে মানে কি?’

‘ঠাণা টোটা।’ চটপট জবাব দিয়েছিল মোহর।

‘টোটা কখনও ঠাণা হয়?’

ভেবে কুল পায়নি মোহর। রহস্যময়ীর মত রঞ্জনা বলেছিল, 'প্রথম দিন তোমার ঠোট শীতল ছিল। একেবারে বরফ। বুঝলে মশাই!'

মাঝে মাঝে পড়াশুনার কথা ওঠে বটে কিন্তু রঞ্জনা সেটা চাপা দেয় অন্য প্রসঙ্গ টেনে। একই সঙ্গে তার মা এবং বাবার কাছে অভিনয় করতে একটুও ব্যস্তিত হয় না। অথচ স্কুলে সে এমন ভান করে বেন মোহরকে চেনেই না। মোহরের দিকে আড় চোখেও তাকায় না। কোনও বিকলে সে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মোহর বিব্রত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হল তোমার?'

'আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।' ঠোট ফোলাল রঞ্জনা।

'কেন? আমি কি করেছি?'

'ওই রোগা প্যাংলো নন্দিনীর মধ্যে কি পেয়েছ যে অতক্ষণ গল্প করতে হবে?'

নন্দিনীর মুখ মনে পড়তেই হেসে ফেলেল মোহর, 'ওমা! আমরা গল্পের বই নিয়ে কথা বলছিলাম!'

'গল্পের বই? তুমি গল্পের বই পড়ো?'

'হ্যাঁ। আমি বই না পড়লে রাতে ঘুমতে পারি না।'

'আমি পড়ি না।' কাছে এল রঞ্জনা, 'অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আর শোন, তুমি কখনও ওমা বলবে না।'

'কেন?' মোহর অবাক হয়ে তাকাল।

'ওমা কথা মেয়েরা বলে। তুমি বলবে কেন?' দু' হাতে জড়িয়ে ধরল রঞ্জনা।

অম্লদা মুখার্জি এক সকালে মেয়েকে ডাকলেন, 'তোর কি হয়েছে?'

মোহর তাকাল, 'কেন? কি আবার হবে?'

'তোর চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আয়নারা দেখিস না?'

মা পাশেই ছিলেন। বললেন, 'আরও জুড়ো শেখাও, চেহারা থাকবে কি করে?'

অম্লদা মুখার্জি গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার মেয়ে অনেকদিন জুড়ো ক্লাসে যায়নি। মোহর, তুই আমাকে তোর কি প্রত্নেম খুলে বল। ধ্যান এসেছিল আমার কাছে। ও খুব দুঃখ পেয়েছে। তুই তো এখন ইনসিনিয়ার কখনও ছিলি না?'

মোহর ওপরের দিকে তাকাল, 'আমার কিছু হয়নি।'

'তোর এবারের পরীক্ষার রেজাল্ট জানিস? ফিফটি থ্রি পারসেন্ট। অত পঞ্চাশ। আর এক নম্বর কম পেলে প্রমোশন আটকে যেত। হাফ ইয়ালিতে বারিশা পেয়েছিল। একটা মানুষ যখন নীচে নামে তখন তার প্রতিক্রিয়া সব দিক দিয়ে হয়। ফুটবল ছেড়ে দিয়েছিস বলে কি তোর কোনও কিছু করতে ভাল লাগছে না?'

'না, তা নয়—'

'আমি খবর পেলাম তুই কারও সঙ্গে গিয়েস না। স্কুলেও কারও সঙ্গে কথা বলিস না। বিকলে শুধু ক্লাসের একটি মেয়ের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকিস। এভাবে তো চলবে না। সবার সঙ্গে মিশতে হবে, নর্মাল মানুষের মত জীবন যাপন করতে হবে।'

ঘরে ফিরে এসে বিদ্যায়ন শুয়ে পড়ল মোহর। নর্মাল মানুষের মত জীবনযাপন করতে হবে। তাহলে কি আমি নর্মাল নই? আর পাঁচজনের সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়? রঞ্জনার কথা মনে পড়ল। রঞ্জনা তার প্রেমিকা, সে প্রেমিক। এটা কি নর্মাল নয়? প্রকৃতি তাকে নারী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে একথা ঠিক কিন্তু সে তো একটি পুরুষের মত আচরণ করতে পারে। আচ্ছা, শুধু পুরুষই নারীর সঙ্গে প্রেম করবে একথা কোথায় লেখা আছে? দুটো মানুষ পরস্পরকে

ভালবাসতে কেন পারবে না? তা কি নর্মাল হবে না? মার্টিনা নাকি একজন নারীর সঙ্গে বসবাস করে স্বামী-স্ত্রীর মত। সেটা কি সবাই মেনে নেয়নি? অবশ্য বলা যেতে পারে বিদেশে আজ যেটা মানছে এদেশে আগামী কাল তা মানবে। সেটা না জানার আগে সবাই অ্যাননর্মাল ভাববে।

কিন্তু রেজাল্ট এত খারাপ হল কেন? এই ব্যাপারটা বিশ্রী লাগছে। হেসে খেলে লিখে তো যাট পাওয়া যায়। রঞ্জনার রেজাল্ট কেমন হল? না, এবার রঞ্জনার কথা সবসময় সে ভাববে না। বেশি ভালো পড়াশুনার ক্ষতি হয়। আর জুড়ো। কীপরে পড়ল মোহর। এখনও তার ইচ্ছে যে কোনও দিন জুড়ো ক্লাসে চলে যাবে। যাব যাব করে দেরি হয়ে গেছে বেশ। আসলে রঞ্জনার কাছে যেতে গেলে জুড়ো ক্লাসে যাওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে। মোহর ভেবে পেল না সে কি করবে? তার কেবলই মনে হইল বাবা যেন সব দেখতে পাচ্ছেন।

সেদিনই রেজাল্ট বের হল। কাড় হাতে নিয়ে মোহর পড়ল ফিফটি থ্রি পারসেন্ট। মন্তব্য কলমে লেখা হয়েছিল, 'অমনোযোগের কারণে মান নিম্নমুখী হয়েছে।'

এইবার কেউ তাকে হারাননি। ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়নি বলে দুঃখ, অপমান হয়েছিল কিন্তু সেটা অন্যেরা জোর করে তাকে করেছে। কাড়টা হাতে নিয়ে তার মনে হল সে নিজেই নিজেকে হারিয়ে দিল।

বিকলে এলে মোহরের মনে হল ভালবাসা একটা অসুখের মত ব্যাপার, যার কোনও গুণধূই নেই। এখন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সবাই জানতে পারে ক্যানসার কিংবা এইডসের কোন গুণধূ আবিষ্কৃত হয়নি। ভালবাসার গুণধূ কেউ কি আবিষ্কার করেছে? নইলে এই সময়টা হলেই রঞ্জনার বাড়ি তাকে এমনভাবে টানবে কেন? সে নিজেকে বোঝাল রঞ্জনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই তার যাওয়া দরকার। আজ ক্লাসে রঞ্জনা যথারীতি তার সঙ্গে কথা বলেনি। ওর রেজাল্ট কেমন হয়েছে তাও জানতে পারেনি সে। এখন থেকে সপ্তাহে একদিন দেখা করবে তারা এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

দূর থেকে রঞ্জনার বাড়িটা দেখতে পেয়ে সে রোমাঞ্চিত হল। রোজ তার আসার সময়ে রঞ্জনা দেওলার বারান্দায় অথবা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে, আঙ্গ নেই। বারান্দায় রঞ্জনার বাবা একাই বসেছিলেন। ওকে ঢুকতে দেখে বললেন, 'দাঁড়াও।'

মোহর দাঁড়াল। কোনও দিন জড়োকে তাকে দাঁড়াতে বলেন না, আজ অস্বস্তি হল।

'তোমার রেজাল্ট কি রকম হয়েছে?'

'ভাল নয়।'

'কত পারসেন্ট?'

'ফিফটি থ্রি।'

'আর রঞ্জনার কত হয়েছে জানো? ফরটি টু। এত পুওর রেজাল্ট ওর হল কেন?'

মোহর হতভম্ব। এত কম নম্বর পেয়েছে রঞ্জনা?

'উত্তর দাও। রোজ বিকলে এখানে এসে কি পড়াশুনা করো তুমি যে রেজাল্ট মুখেও উচ্চারণ করা যায় না? তুমি আসার আগে ও প্রায় সিরিট পারসেন্ট পেত। সেই মেয়ের এমন অধঃপতনের জন্যে তুমি দায়ী।'

মোহর মাথা নিচু করল। কি জবাব দেবে সে?

'আমড এগুলো কি? পকেট থেকে গোটা চারেক কাগজ বের করলেন ডব্লোকে। বুঝতে পারল না মোহর। অবাক হয়ে তাকাল।

'উত্তর দাও।'

'ওগুলো কি?'

‘চিঠি। কোনও ছেলে লিখলে বলতাম প্রেমপত্র। তার ভবিষ্যতের ব্যাৱোটা বাজিয়ে নিতাম আমি। রঞ্জনার কাছে ছিল, ওর মা পেয়েছে।’  
রঞ্জনা বলেছে ওগুলো তোমার লেখা। পড়ে গা গুলিয়ে ওঠে। তোমার বাবা মাস্টারমশাই, বিশিষ্ট ভদ্রলোক, আর তার মেয়ে হয়ে এমন কুৎসিত চিঠি লিখেছে তুমি রঞ্জনকে?’ উদ্বেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

‘বিশ্বাস করুন আমি রঞ্জনকে কখনও কোনও চিঠি লিখিনি।’  
‘এগুলো তুমি লেখোনি। নিজের নাম তলায় না লিখে খুব চালাকি করেছ বলে ভাবছ? হাতের লেখা মেলাতেই ধরা পড়ে যাবে।’  
‘আপনি হাতের লেখা মোলালে নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।’  
‘চমৎকার। আমি সোঁটা করতে গেলে হলুদপুরের কারও আর জানতে বাদ থাকবে না ঘটনটা।’

এইসময় ভেতর থেকে রঞ্জনার মায়ের গলা ভেসে এল, ‘এত কথা না বলে ওকে বিদেয় করে। জ্ঞানিয়ে দাও এ বাড়িতে ফেল আর কখনও না প্যা দেয়।’  
মোহর ঠোট কামড়াল। তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, ‘রঞ্জনা আপনাদের বলেছে ওইসব চিঠি আমি লিখেছি? আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘নো। কোনও কথা নয়। ওকে তুমি আর কখনও ডিসটার্ব করবে না। তেমন হলে আমি হেডমাষ্টারের কাছে যাব। গোট আউট।’ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

চুপচাপ মাথা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল মোহর। অপমানে, দুঃখে চোখে অন্ধকার দেখাছিল সে। তার দোষ কোথায়? রঞ্জনা তাকে ডেকেছিল বলেই সে এ বাড়িতে এসেছিল। ওর বাবা নিজের মেয়েকে বলতে পারতেন যা বলার। তাকে বলতে গেলেন কেন? সে যদি ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বলে দিত? হঠাৎ তার মনে হল উনি সেকথা বিশ্বাস করতেন না।

সোজা বাড়িতে ফিরে এল সে। কারও সঙ্গে কথা না বলে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এখন তার মনে হচ্ছে রঞ্জনা নিজেকে বিচারার জন্যে তার নামে দোষ চাপিয়েছে। এটা কেন করল রঞ্জনা। কিন্তু ওই চিঠিগুলো? ওগুলো তো সে কখনও লেখেনি। ওর বাবা বললেন খুব খারাপ ব্যাপার কথার প্রেমপত্র। খারাপ কথা দিয়ে প্রেমপত্র লেখা যায় নাকি? ওগুলো কে লিখেছে রঞ্জনকে? অন্য কোনও মেয়ে? নাকি ছেলে? প্রেমের ব্যাপারে রঞ্জনা তার থেকে অনেক বেশি জানে। সেই জানাটা কি ও অন্য কারও কাছে জেনেছে যে ওই চিঠি লিখেছিল? এবার নিজেকে প্রতারণা বললে মনে হচ্ছিল তার। মোহর কঁদে ফেলল।

পায়ের আওয়াজ কানে আসেনি। হাতের স্পর্শে সে সচকিত হলে।  
অন্নদা মুখার্জি বললেন, ‘ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই। এই যে চোখের জল ফেললে এইটে তোমাকে সারা জীবন মনে রাখতে হবে।’

মোহর হঠাৎই মুখ ফিরিয়ে বাবার কোলে মুখ ঝাঁকে ছুঁ করে কঁদে উঠল।  
মাখায় হাত বেলালেন অন্নদা মুখার্জি, ‘ঠিক আছে। তুমি বুঝতে পারলে নেমে গেলে কি রকম খারাপ লাগে? নিশ্চয়ই কোথাও তোমার ভুলটি ছিল। সেই ভুলটিা মুছে বের করা। সিরিয়াস হও, সিনসিয়াস হও। তাহলেই হবে।’

চোখ বন্ধ, বুকে কাঁপুনি। সে যে জন্যে কাঁদছে তা অন্নদা মুখার্জির জানার কথা নয়। কিন্তু মোহরের মনে হচ্ছিল বাবাকে সে কখনই বলতে পারবে না সিনসিয়াস এবং সিরিয়াস হওয়া সঙ্গেও রঞ্জনা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে চুপচাপ বাবার আদর পেতে পেতে চিঠি করল দ্বিতীয়বার ওই এক অসুখে আর কখনও আক্রান্ত হবে না।

ধ্যানদা ওকে দেখে খুব গভীরভাবে তাকালেন, ‘কি ব্যাপার?’

‘আমি আবার শিখতে চাই।’

‘না। আমি ইনসিনসিয়াস ছাত্রদের পছন্দ করি না।’

‘আমি এখন থেকে আর ঝাঁকি দেব না।’

‘ভবিষ্যতে কি করবে তা জানতে চাই না, কেন এতদিন আসোনি তার কৈফিয়ত কি!’

‘পড়াশুনা—’ বলতে গিয়ে থেমে গেল মোহর। মনে হল মিথ্যা কথা বলছে।

‘ধ্যামে কেন? খুব পড়াশুনা করছে তাই সময় পাওনি। তাই?’

‘আমি ক্ষমা চাইছি।’

‘তুমি এখানে আসোনি অথচ রোজ বিকেলে আজ্ঞা মারতে গিয়েছ।’

মোহর জ্বাব দিল না। অন্যদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ধ্যানদা। সেখানে কয়েকটা ছাত্র অনুশীলন করছে। ওরা সিনসিয়াস। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধ্যানদা বললেন, ‘এখানে যা শিখছে মনে আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘শরীরে সোঁটা নিতে পারাবে?’

‘পারব।’

‘তাহলে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। যদি দেখি সব ঠিক আছে তাহলে সুযোগ পাবে।’

ধ্যানদা তালি বাজিয়ে ছেলগুলোকে ডাকলেন। ওরা কাছে এলে একজনকে বললেন, ‘বিনোদ, তুমি মোহরকে আটক করবে। ও নিজেকে সামলাক। যাও, মোহর তৈরি হয়ে এসো।’

তৈরি হতে হতে মোহর বুঝল তার কপালে দুর্ভাগ্য আছে। বিনোদ বেলেটর জন্যে তৈরি হচ্ছে। খুব ভাল জুড়ে জানে। ওকে সামলাবার জন্যে কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ধ্যানদা বলতেন না। আজ্ঞা নেহাতই রেগে গিয়ে এই পরীক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু যা হয় হোক, সে সিদ্ধিয়ে যাবে না। মোহর তৈরি হল।

বিনোদকে কিছু বলছিলেন ধ্যানদা আলাদা দাঁড়িয়ে। অন্য ছাত্ররা মজা দেখার মত মুখ করে দুরে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যানদার নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিনোদ তাকে আক্রমণ করল। কিছু বোঝার আগেই মাটিতে ছিটকে পড়ল মোহর। ছেলগুলো হেসে উঠল। ধীরে ধীরে উঠে বসল মোহর। সোজা হস্কে দাঁড়াতেই মোহর এগিয়ে এল দু’হাত কোমরের সামনে তুলে ধরে। ও দু’হাতে পাক ধরে পা তুলবে। মোহর চকিতে সরে গিয়ে পায়ের পছনে আঘাত করল। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল বিনোদ এবং প্রায় ডিসবাল্কি ষাওয়ার মত লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। শেষ মুহুর্তে বসে পড়তে পারল মোহর। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার মুহুর্তে বিনোদের পায়ের আঘাত লাগল তার নিতম্বে। একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। ধ্যানদা বললেন, ‘স্টপ।’

বেশ মন্ত্রণা হচ্ছিল শরীরে। ধ্যানদা কাছে এসে ওকে তুলে ধরলেন। এইসময় স্কোরে হাততালির আওয়াজ হল। দেখা গেল, উল্টোদিকে একা দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে প্রাণেশ। এখন আর তার শরীরে প্লাস্টার নেই। প্রাণেশ বলল, ‘কি রে বিনোদ, একটা মেয়ের সঙ্গে খুব লড়াইস?’

মুহুর্তেই মোহরের মনে হল বিনোদের কাছে পরাজয়টা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু খুব লাগছিল তাকে অবহেলা করছে। সে ধ্যানদার দিকে তাকাল। ধ্যানদা তখন এগিয়ে গিয়েছেন প্রাণেশের দিকে, ‘তুই ওভাবে কথা বলছিস কেন? বিনোদকে আমিই বলেছি মোহরের সঙ্গে লড়তে।’

‘কেন? একটা নভিসের সঙ্গে ওকে লড়তে বলেছেন কেন?’

‘সোঁটা তুই বুঝবি না।’

‘আপনার অনেক কিছুই আমি বুঝি না।’ প্রাণেশ অদ্ভুত হাসল, ‘বিনোদকে আপনি ফোবার করেন।’

‘ফেবার করি? কি করে বুঝলি?’  
প্রাণেশ উদাস মুখে ওপরে তাকাল। এই তাকানোটা তান। মোহর ওর ঠোটে হাসি দেখতে পেল। ধ্যানদা বললেন, ‘শোন প্রাণেশ, তুই যখন আর প্রাকটিস করবি না বলে ঠিক করেছিস তখন আর এখানে আসবি না।’

‘আপনি না বললে আসব না। মেয়েছেলেকে প্যাদাচ্ছে বিনোদ এটা বলা যদি অপরাধ—’

প্রাণেশের কথা শেষ হবার আগেই মোহর চিৎকার করে উঠল, ‘মেয়েছেলে মানে?’

প্রাণেশ মোহরের দিকে তাকাল, ‘মেয়েছেলে মানে মেয়েছেলে।’

‘মেয়েছেলে বললে বেশ তাচ্ছিল্য করা হয়, তাই না?’

‘যা সত্যি তা বলা কিয়ই অম্যায় নয়।’

‘ঠিক আছে। আপনি আমার সঙ্গে লড়ুন।’

প্রাণেশ বলল, ‘কেন মিছিমিছি মার খাবে। আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না।’

‘আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি।’ সোজা হয়ে দাঁড়াল মোহর।

ধ্যানদা মাঝখানে ছিলেন, বললেন, ‘নো। প্রাণেশের হাতের হাড়ে চির ধরেছিল। প্লাস্টার করা হয়েছিল। ওর উচিত হবে না আবার কারও সঙ্গে লড়া।’

মোহর বলল, ‘তাহলে ওকে বলুন তাচ্ছিল্য করে কথা না বলতে।’

‘এটা ভাই আমি জীবনভর করে বার। ব্যাটাছেলে মান মলদ আর মেয়েছেলে মানে দুবলা।’

কি ধ্যানদা, আমি ভুল বলছি? বেশ, চলে এসো। এমন শিক্ষা দেব—’

‘নো। আমার এই জায়গা মারপিট করার জন্যে তৈরি করিনি। তোমরা জুড়ো শিষ্য আত্মরক্ষা করার জন্যে, লড়াই করার জন্যে নয়।’ ধ্যানদা চিৎকার করলেন।

মোহর এগিয়ে গেল ওর দিকে, ‘আমি তো আত্মরক্ষাই করছি। উনি আপনাদের সবার সামনে আমাকে আক্রমণ করছেন আর আমি আত্মরক্ষা করব না?’

‘যা হচ্ছে তাই করো। তুমি কটকটু শিখেছ যে ওর সঙ্গে পারবে? শুধু জেদ থাকলেই জীবনে জেতা যায় না, জেতার জন্যে যোগ্যতা দরকার হয়। প্রাণেশ, ইউ গোট আউট।’

প্রাণেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আবহাওয়া এখন ধুমধামে। ধ্যানদা ঘুরে দাঁড়ালেন, ‘ঠিক আছে, আজ থেকে প্রাকটিস শুরু করে দাও। আর যেন গাফিলতি না দেখি।’

শরীর বলছে তুমি নারী। সেই কারণেই প্রকৃতি তোমাকে পুরুষের থেকে আলাদা করে গঠন করেছে এবং লালনও। তুমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কত দিন যেতে পার?

দুান্নের সময় যখন ভাবনা মনে এলেই মোহর প্রতিবাদ করে, ‘আমি পারি।’ একটি পুরুষের সঙ্গে নারীর আপাত পার্থক্য বুক এবং নিতম্বে। নিয়মিত খেলাধুলাও অনুশীলন করায় তার নিতম্বে দেখমাশে ক্ষমতে পারেনি। ছিপছিপে লম্বা শরীরে সেই কারণে বুকের বাড়তি অহঙ্কার নেই। যা হয়েছে, যা কোনও দিন অস্বীকার করতে পারবে না মোহর তাকে প্রকট হতে না দেবার চেষ্টা সে যেভাবে এনে ফেলেছে। প্রকৃতি নারীর বুক সৃষ্টি করেছেন সন্তানের খাদ্যাভ্যন্তর পর্যায় করতে। কিন্তু এখন পৃথিবীর অর্ধেক নারীরা খাদ্যাভ্যন্তর হিসেবে বুক ব্যবহার করতে চায় না। তাদের লম্বা থাকে সৌন্দর্যবর্ধনে। আর এই ইচ্ছের পেছনে একটা হাস্যকর যুক্তি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না মোহরের। সে যদি কখনও বিয়ে না করে, সন্তানধারণার করার কোনও প্রয়োজন বোধ না করে তাহলে প্রকৃতিকে অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারবে।

বোল বছর বয়সেও মেয়ের পোশাকের কোনও পরিবর্তন হয়নি। চালচলনও ছেলেমি।

জুতোতে ধ্যানদার প্রিয় ছাত্র। শান্তি স্যার অনেক বলা সত্ত্বেও সে আর্থলেট হিসেবে মাঠে নামতে চায়নি। হেসে বলেছিল, ‘আপনারা তো আমাকে ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াতে দেখেন না।’

শান্তি স্যার বকেছিলেন, ‘সবসময় ওই এক কথা। ছেলেদের সঙ্গে তুই পারবি কখনও? ওয়ান্টে মিটের রেকর্ড দেখেছিস? পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মেয়ের দৌড়ের রেকর্ড ছেলেদের অনেক পেছনে।’

‘হাত পারে। কিন্তু মেয়েদের ওই সময় ইন্ডিয়ান কজন ছেলে করতে পারছে? স্টেটফিকে কখনও জিসান আলি হারাতে পারবে টেবিলে?’ ফৌস করে উঠেছিল মোহর।

‘অন্যদের ওপর নির্ভর করে কথা বলিস না। বুঝা যতটা পোলভল্টে ওঠে পৃথিবীর কোনও মেয়ে উঠতে পারেনি এটাই সত্যি।’ শান্তি স্যার বোঝান।

কিন্তু মোহরের ওই এককথা। সে মেয়েদের সঙ্গে দৌড়াতে বা খেলতে চায় না। তাকে অব্যাহ সুযোগ দেওয়া হোক। তাতে হেরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন মিছিমিছি পরিশ্রম করে কি লাভ।

একমাত্র নন্দিনী ছাড়া মোহরের কোনও বান্ধবী নেই। ইতিমধ্যে সে আবিষ্কার করেছে মেয়েদের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত কথা বলা যায় না। দুচারটে কথা পর তারা এমন সব বিষয়ে চলে আসে যাতে বিদ্মুদ্রা রুচি নেই তারা। বিষয়গুলো সীমাবদ্ধ থাকে সিনেমা, পুরুষচর্যা আর পোশাক-প্রাস্থানে। পুরুষচর্যার সঙ্গে মিশে থাকে অন্য মেয়ে সম্পর্কে নিম্নপ্রচার। মোহরের মনে হয় বেশির ভাগ মেয়েই মেয়েদের সহ্য করতে পারে না, মনে মনে ঈর্ষা অথচ সেইসব মেয়ের সামনে পড়লে এমন দাব করে যে তারা কত বন্ধু। এত ক্রত মুখোশ পল্টাটে ছেলেরাও পারে না। অবশ্য ছেলেদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। তারা আঙা মার ফিল্টস্টার নিয়ে, খেলাধুলা এবং মেয়েদের শরীর নিয়ে। কোনও ছেলে যদি একটা এগিয়ে যায় তাহলে তারাও হীনমন্যতায় ভোগে কিন্তু সেটা প্রকাশে আড়াল আড়াল খোঁজে না। তাদের কাছে যা সত্যি সেটা তারা গোপন করে না। কিছু মেয়েলি স্বভাবের ছেলেকে বাদ দিলে মোহরের মনে হয়েছে বেশির ভাগই অনেক উদার।

নন্দিনীকে তার আলাদা বলে মনে হয়। নন্দিনী রোগা, ময়লা, চোখে ভারী চশমা আছে। নন্দিনী সুন্দরী নয়। হেসে বলে, ‘কানাছেলের নাম পদালাচনও তো অনেকে রাখেন। আমার মা রেবেছিলেন নন্দিনী।’ তিনি ভেবেছিলেন আমি হয়তো রক্তকরবীর মত প্রাণের স্পর্শ আনব। অথচ দ্যাখো, আমার না আছে সেই চেহারা, না ক্ষমতা।’

নিজের চেহারা সম্পর্কে যে মেয়ে সচেতন তার বক্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু নন্দিনী পড়াশোনা ভাল। এবার স্টেটে ওয়াশের পেয়েছে। মাস্টারমশাইরা ওর সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা রাখেন। মোহর একে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?’

‘খারাপ লাগলে কথা বলব কেন?’

‘এটা এড়িয়ে যাওয়া হল। আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারি না।’

‘তোমার মা তো একজন মেয়ে।’

‘ঠিক। মায়ের চেয়ে বাবার সঙ্গে আমার ভাব বেশি।’

‘তোমার মাধায কিছু একটা টুচার পেয়েছে। আমায় মোহর তুমি সেইভাবে সব ভাবছ। অবশ্য এ নিয়ে চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। যে যা ভাল মনে করে সে তাই করবে।’

‘লোকে যদি বলে আমি যেটা ভাল মনে করছি তা ভুল।’

‘ভুল যদি হয় তাহলে একদিন না একদিন তুমি বুঝতেই পারবে, এখন থেকে ভেবে লাভ কি।’ নন্দিনী হাসল, ‘জানো, তোমার নামে একজন শিশুী আছে। তিনি মহিলা।’

‘মোহর নামে মহিলা?’ মোহর অবাক।

‘হ্যাঁ। যা বাবাইলেন। তাঁর আসল নাম কফিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।’

‘সে কি?’ মোহরকে খুব বিস্মিত দেখাচ্ছিল, ‘আমি জানতাম মোহর হল—’

‘এমন একটা শব্দ যার কোনও লিঙ্গ হয় না। শিল্পীও তো তাই। তিনি মহিলা না পুরুষ তা নিয়ে কি আমরা ভাবি? আমরা তার নাম নিয়েই গর্বিত। নিন্দীনা বলল, ‘পরীক্ষার পরে মায়ের সঙ্গে আমি শান্তিনিকেতনে যাব।’

‘ওখানে তো সব মেয়েলি ছেলে থাকে।’

‘কি বাজে কথা। একসময় বাঙালিরা এমন কথা বলে মজা পেত। সেটাই মুখে মুখে চলে এসেছে। বাস্তবে তা নয়। যাক গে, আত্মঘাতী বাঙালি পড়লে?’

‘হ্যাঁ!’ ঠোট মোচড়াল মোহর।

‘কি মনে হল?’

‘অনেকটাই সত্যি কথা। সবটা আমি বুঝতে পারিনি।’

‘তুমি এর আগে কখনও একটা প্রবন্ধের বই পুরোটা পড়েছ?’

‘না। কেন?’

‘এই বইটা তো পড়তে পারলে। সেটাই বা কম কথা কি!’

বাড়িতে ফিরে এসে মন খারাপ হয়েই থাকল মোহরের। এককাল জানত এই পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কোনও মানুষের নাম মোহর নেই। সে একাই মোমটার মালিক। অথচ আজ জানা গেল অনেক নামী একজন মহিলার নামও তাই। আচ্ছা উনি মোহর বন্দোপাধ্যায় হিসেবে রচিত না হয়ে কণিকাকে বেছেছিলেন কেন? মোহর নামটিকে কি তাঁর ভাল লাগেনি? শেষপর্যন্ত মনে হল তার জানার চেয়ে অজানা পৃথিবী বহু বহু গুণে বড়। সেখানে মোহর নামে অনেক অনেক মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু আপাতত তার লক্ষ্য একজন। তিনি দেশবরেণ্য শিল্পী। তাঁকে কি করে অতিক্রম করে যাবে সে এটাই একমাত্র ভাবনার বিষয়।

পরীক্ষার আগে ধ্যানদা নিজে থেকেই ছুটি দিয়েছিলেন। মাসখানেক আঠারো ঘণ্টা বই মুখে নিয়ে পড়েছিল মোহর। অমদা মুখার্জি তাকে মাঝেমাঝেই একটু ঘুরে আসতে বলতেন। কিন্তু সেটা না করে কবিতার বই পড়ত মোহর কিছুক্ষণ। অমদা মুখার্জির সাহিত্যে প্রীতি আছে। নানান পত্রিকা সন্গ্রহ করা বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হলদপুরে থেকেও যে সেগুলো তিনি পেয়েছেন তা দেখে নন্দিনীও অবাক। পুরনো মাসিক বসুমতী থেকে অনুপূর্ণ পত্রিকা কিছুই অভাব নেই। নন্দিনীর উৎসাহে মোহর জীবনানন্দ দাস পড়েছে। পড়ে মনে হত ভুলোক পৃথিবীর অল্পত অল্পত সৌন্দর্য আকর্ষণ করে তার মধ্যে নিজস্ব হস্তাশা বুন দিয়েছেন। মরিচ শব্দটির ব্যবহার সে এই বয়সেই করতে শিখল। নন্দিনীকে সে কথা বলতে মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল, ‘জীবনানন্দের কবিতা পড়ে তোমার কি মনে হয় বল তো?’

‘আমি বলতে পারি কিন্তু তোমার শুনতে খারাপ লাগবে?’

‘ওর কবিতা তোমার ভাল লাগেনি?’

‘মোটাই না। পড়লে নেশা হয়ে যায়।’

‘তাহলে?’

‘আমার মনে হয়েছে কবিতার লাইনে লাইনে একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন কবি এবং সেখানে বসে নিজেকেই রক্তাক্ত করেছেন। এই রক্তাক্ত হওয়াতে তিনি মোটেই দুর্ভাগ্য হননি বরং নিজস্ব রক্তবরা চেহারা দেখে খুশি হয়েছেন।’ গোলাবুলি বলে ফেলল মোহর।

ওর দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল নন্দিনী। তারপর নিচু গলায় বলল, ‘আচ্ছা, তুমি লেখ না কেন?’

‘আমি?’ চিংকার করে হেসে ফেলল মোহর, ‘পাশল।’

‘ভবে শ্যাখো। লেখা এমন একটা মাধ্যম যা শূন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকতে কেউ তোমাকে বাধ্য করবে না। এখন লেখিকা বলে কোনও শব্দ নেই।’

লেখিকা বলে কোনও শব্দ নেই? হকচকিয়ে গেল মোহর। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী লেখিকা না সাহিত্যিক? বুকের মধ্যে অজুতভাবে ইচ্ছেটা জন্মে গেল। আমি কি লিখতে পারব? তারপরেই মনে হল কি লিখব? কিভাবে লিখব? ভাবতে যা ভাল লাগে তা কি হবে লেখা যায়? কোনও একটা গম্প অথবা উপন্যাস পড়লে মনে হয় সেটা লেখা হয়েছে নিশ্চয়ই কিছু নিয়মকানুন মেনে। মোহরের মনে হল সেইসব নিয়ম তো তার জানা নেই। সে যা ইচ্ছে লিখলে লোকে পড়বে কেন? একজন মানুষ তার মনের মত লেখা লিখে শেতে পারেন কিন্তু তার যদি কোণ পাঠক না থাকে তবে তিনি কি লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন?

পরীক্ষাটা হয়ে গেল। অমদা মুখার্জি বলেন, ‘ক্রিকেট খেলায় কিছু খেলোয়াড় প্রায় প্রতিটি ম্যাচে বাট সস্তর সারলীলাভ করে আউট হয়ে যায়। সেখুঁরি করতে খুব দেখা যায় তাদের?’

তার অবস্থা ঠিক তাই। ইচ্ছে করলে নম্বর বাড়তে পারিস কিন্তু ইচ্ছেটাই করবি না। ফাইনাল পরীক্ষায় সেই ইচ্ছেটা এসেছিল কিন্তু শেষমুহুর্তে নন্দিনীর কথায় লেখক হবার চিন্তা ঢুক বাওয়ায় মন গোলমাল পাকাল। তবে রেজল্ট ভাল হবেই এবং অমদা মুখার্জি চান মেয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে যাক। জেলাশহরে কলেজ আছে কিন্তু খরচ যখন একই হবে তখন ওর কলকাতায় যাওয়াই ভাল। নন্দিনীর মায়েরও সেইরকম বাসনা। নন্দিনীকে অমদা মুখার্জি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?’

নন্দিনী চটপট জবাব দিয়েছিল, ‘স্বাভাব্য হওয়া। একটু ভালভাবে।’

‘কিভাবে হবে?’

জয়েন্ট দেব। যদি ডাক্তারি পাই তাই পড়ব। এদেশে আর যাই হোক ডাক্তাররা বেকার থাকে না।

মোহরের মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তোমার বা মায়ের কথা ভাবছেন না?’

‘পাগল। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে ওসব কথা উঠবেই না।’ নন্দিনী হেসেছিল, ‘তাছাড়া আমার যা চেহারা তাতে টাকাপয়সা না দিলে কেউ বিয়ে করবে না। এবং তারপর তো সারাজীবন স্কিমির করতে হবে।’

‘ওকথা বলছ কেন? দেখতে যারা ভাল নয় তাদের কি বিয়ে হয় না?’

নন্দিনী বলেছিল, ‘ছেলের বিয়ের সময় সব বাবা মা চায় সুন্দরী বউ আসুক। আমার ভাই থাকলে আমিও চাইতাম। যাদের হয় তাদের তো মাথা নিচু করে শব্দবর্ষণে ডুকে ত হয়। তারপর স্বামী যদি মারা যায় তখন অন্যের গলগহ হয়ে থাকে। এখন দিনকাল বদলে যাচ্ছে। আপনারা যতই মতবিরোধ হোক ছাড়ছাড়ির কথা ভাবতে পারেন না। অভ্যাসে একসঙ্গে থেকে যাচ্ছে। আমাদের সময় সেটা তো নাও হতে পারে। আর্থিক নিরাপত্তা না থাকলে তেমন হলে চলবে কি করে?’ খুব শান্তমুখে কথাগুলো বলেছিল নন্দিনী।

মোহরের মা জবাব দিতে পারেন নি। তাঁর শুধু মনে হয়েছিল এই ছোটখাটো রোগা কালো মেয়েটা মোহরের থেকে কম যায় না। শুধু দুজনই প্রকাশের পদ্ধতিটা আলাদা।

পরীক্ষার পর অদ্ভুত অবসর। সকাল থেকেই বই নিয়ে বসে যায় মোহর। পরপর সিঁড়ি ভেঙে পড়া নয়, বন্ধিমের পর সমরেশ বসু পড়তে কোনও দ্বিধা নেই। গোপাঙ্গে পড়ে গেলে হতটা জানা যাবে ততটাই যেন লাভ। বিকেলবেলায় সে এখনও ধ্যানদার কাছে যায়। যদিও সে টের পাচ্ছে

জুড়োর আকর্ষণ তেমনভাবে নেই। নেহাতই অনেক বছর আগে ধ্যানদাকে কথা দিয়েছিল বলেই এখনও যাওয়া। মোহরের ওজন এখন বায়ট্রি, ল'শায় পাঁচ ফুট পাঁচ। শরীর মেদ নেই বলে বেতের মত ছিপছিপে দেখায়। অখচ মজাটা এমনই হলদপুরের কোনও পরিচিত মুখ গুরু দিকে তাকায় না, বিরক্ত করা দূরের কথা।

বিলম্ববেলায় ধ্যানদা একটা খবর দিলেন। কলকাতায় সারা বাংলা জুড়ে হচ্ছে। সংগঠকরা ধ্যানদার পরিচিত। তিনি উপেন আর মোহরের নাম পাঠিয়েছেন সেখানে। মোহর যেন বাস্তবিত্তে কথা বলে অনুমতি নেয়। দিন চারেকের জন্যে কলকাতায় যেতে হবে। প্রস্তুতবাটা শোনামার লাক্ষিয়ে উঠেছিল মোহর। বই পড়তে পড়তে কলকাতা তাকে এখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে কলকাতার অনেক রাস্তার বিবরণ ঠিকঠাক দিতে পারে। সেই কলকাতায় পৌছানোর জন্যে পরিষ্কার ফল বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না এটা তো বিরাট পাওয়া।

মাঠ ভিত্তিতে হলদপুরের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল মোহর। অঙ্ককার না নামলে এই পথটায় অনেক কম সময় লাগে। এইসময় মোটার বাইকের আওয়াজ শোনে এল। সে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখতে পেল প্রাণেশকে। কয়েক বছর আগের সেই ঘোনার পর সে প্রাণেশকে খুব কমই দেখতে পেয়েছে। ধ্যানদার ওখানে আর কখনও যায়নি প্রাণেশ। বড়লোকের ছেলে প্রাণেশ নাকি এখন আদৌ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে না এমন কানায়ুসা আছে। তবু প্রাণেশের কথা মনে এলে কি রকম অস্বস্তি হয়। সেটাকে নিজেই বুঝতে পারে না মোহর।

প্রায় গায়ের পাশ দিয়ে বাইকটাকে এমনভাবে নিয়ে এল প্রাণেশ যে লাক্ষিয়ে সরে দাঁড়াল মোহর। প্রাণেশের চেহারায় আর একটু জৌলুস এসেছে, একটু মোটাও হয়েছে। চোখে রঙিন চশমা। বাইকে বসেই প্রাণেশ বলল, 'কিরে? চিনতে পারছিস?'

'তুই কি করে ভাবলি আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ?'

'আই বাপ! আমাকে তুই বলছে! সাহস তো কম না!' প্রাণেশ বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল। চোখ থেকে রঙিন চশমা খুলল, 'বড় হয়েছিস না বেড়ে গিয়েছিস?'

'তুই যদি আমাকে তুই বলতে পারিস তাহলে আমি কেন পারব না?'

'অন্য কেউ হলে মেরে মুখ ফাটিয়ে দিতাম—' চোঁচিয়ে উঠল প্রাণেশ।

'চেষ্টা করে দ্যাখ।' পা ফাঁক করে দাঁড়াল মোহর।

'ওই শালা ধ্যান যা শিখিয়েছে তার কিছুই কাজে লাগবে নারে।' চুক চুক শব্দ করল প্রাণেশ, 'তোরা ফিগারটা মাইরি বেশ খাবো খাবো হোয়ে।'

'খেয়ে দ্যাখ, হজম করতে পারলে বুঝব তোর বাপ মা ছিল!'

'কি বললি?' চিৎকার করে ছুটে গেল প্রাণেশ। তৈরি ছিল মোহর। একটা বড় ভারী শরীরকে কিভাবে আছড়ে ফেলতে হয় সেটা তার জানা। প্রাণেশ এতটা আশা করেনি। সে ডেবেছিল মোহরের জুড়ো শেখা নেহাতই শৌখিনতা ছাড়া কিছু না। কয়েক বছর আগে উপেনের কাছে মোহর বেরকম আছাড় খেয়েছিল তার স্মৃতিটিই সে ধরে রেখেছিল। নিজে চটায় থাকেনি তাই পরিস্থিতি যখন শরীরকে জাগাতে চাইছে তখন শরীর সাড়া দিচ্ছে না। মোহরের শরীর চালকের ক্ষিত্রতায় বিভিন্ন ভঙ্গি নিয়ে আঘাত করছিল প্রাণেশকে। প্রাণেশ উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

জায়গাটা নির্জন হলেও মারপিটের আভাস পাওয়ায় কিছু মানুষ ছুটে এসে সবিস্ময়ে দৃশ্যটি দেখছিল। মোহর তখন প্রাণেশের জখম হওয়া হাতটা চেপে ধরেছে, 'তোরা এই হাত একসময় ভেঙেছিল, মনে আছে? আবার ভেঙে দেব?'

হীপাতে হীপাতে প্রাণেশ বলল, 'তুই যা জিনিস সব পারিস।'

'জিনিস? আমি কি মাল? হাতে চাপ বাড়াল মোহর।

'উঃ। বাপস! আমি প্রশ্নো করলাম আর তুই খারাপভাবে নিচ্ছিস।'

'জিনিস বলা কি প্রশ্নো করা?'

'নিশ্চয়ই। তুই অন্য পাবলিককে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ।'

'তোকে আজ আমি ছেড়ে দিলাম।'

'কেন? ছাড়ার কি দরকার? হাত ভেঙে দে।' উপুড় হয়েই বলল প্রাণেশ।

'নাঃ।' হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মোহর।

'পেট্রি চলে যাওয়ার সময় গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে যায়। তুই সেরকম করলেই পারতিস।'

ধীরে ধীরে বলল প্রাণেশ।

'তুই আমাকে পেট্রি বললি? তুই নিজে কি?'

'পেট্রিকে আর কি বলব? শালা মায়ের কি জোর!'

'অন্য কেউ হলে সত্যি সত্যি হাড় ভেঙে দিতাম, তুই বলে ছেড়ে দিলাম।'

'অন্য কেউ হলে আমি চেন্সার বালি করে দিতাম—' কোমরের ভেতরে আলাদা ব্যবস্থা করে রাখা রিভলবার বের করে দেখাল প্রাণেশ।

'তুই এসব রাখিস নাকি সঙ্গে?' বেশ ঘাবড়ে গেল মোহর।

'রাখতে হয়। অঙ্ককার গায়ের জোর অথবা জুড়োর কায়দায় কোনও লাভ হয় না। চেন্সার থাকলে তুই শের, নইলে ভাগে চলে যাবি।'

'তুই এসব কথা শিখলি কি করে? হলদপুরে কেউ বলে না।'

'হলদপুরে সবাই তাই আমাকে চমকায়ে।' উঠে দাঁড়াল প্রাণেশ।

'রিভলবারটা দেখি।' হাত বাড়াল মোহর।

'কি করবি?'

'দেখা। আমি কখনও রিভলবার হাতে নিইনি।'

'ফোটা। দেখতে হবে না। বহুত খতরনাক জিনিস।' ওটা যথাস্থানে রেখে দিল প্রাণেশ, 'তুই কি এখনও ধ্যানদার কাছে যাস।' যাস বলেই মনে হল। তাই না?'

'হ্যাঁ। তুই কি করিস?'

'মাল কামাই। মাল না থাকলে কেউ পাতা দেবে না। যাকগে, তুই আমাকে এত প্যাঁদালি অখচ আমি কিছুই বললাম না, এটা তো হতে পারে না। আয় তোকে একটা চুমু খাই।'

'ভাগ। তোকে চুমু খাব কেন?'' ছিটকে সরে গেল মোহর।

'আরে তুই খাবি কেন, আমি খাব বলেছি।'

'ওসব আমার কাছে হবে না?'

'ওহো তুই তো আবার মেয়েলোকে নস। ঠিক হয়। বাইকে ওঠ, পৌছে দিয়ে যাচ্ছি।' প্রাণেশের গলার স্বরে এখন কিছু ছিল যে মেয়েলোকে শব্দটির জন্যে এখন আর কথা ব্যাড়া না মোহর। চুপচাপ থানকটা দূরত্ব রেখে বাইকের পেছনে চেপে বসল। যারা দৃশ্যটি দেখতে এসেছিল তারা ভেবে পাচ্ছিল না পরিণতি এরকম হল কি করে? একটা লাল পড়ে যাওয়াই তো এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছিল।

রঞ্জনা সঙ্গে আর কখনওই মোকাবিলা করা হয়নি। অনেকগুলো বছর পরেও মাঝে মাঝে মোহরের মনে ওর কথা আসে। কি চমৎকার ভালবাসতে পারত রঞ্জনা। মনের কোথাও কঁক থাকত না। বোধহয় ওই কারণেই বেচারার পড়াশুনাটা ভাল এগোচ্ছিল না। মাঝখানেই একটা ক্লাসে দু বছর থাকতে হয়েছে। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সেই সঙ্কের পর রঞ্জনা যেন তাকে চিনতেও পারে না আর সময় বয়ে যাওয়ার তারও ওর সম্পর্কে আকর্ষণ কমে গিয়েছে। এই আকর্ষণ কমে যাওয়ার পেছনে কিছু গল্প হয়তো কাজ করেছে। সবাই জানে রঞ্জনা একই সঙ্গে অন্তত দুজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে। একটু দেখতে ভাল এমন কোনও পুরুষ হলদপুরে নেই যে ওর

প্রেমপর পায়নি। এমন পুরুষপ্রেমিক যে কেন তাকে প্রেমের জন্যে বেছে নিয়েছিল তা বুঝতে পারে না সে।

কলকাতায় জুড়োর জন্য যাওয়ার অনুমতি দিতে অম্মদা মুখার্জি আপত্তি করেন নি। মেয়ের যে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে এটা তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেহেতু মহিলা তাই তাঁর পক্ষে একে একা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া ছুতো এমন একটা খেলা যে অস্বস্তি থাকেই। আহতে হলে কে দেখবে সেখানে যতই ধ্যানদা সঙ্গে থাকুক। শেফখান্ড ঠিক হল অম্মদা মুখার্জি নিজের খরচে মেয়ের সঙ্গে যাবেন।

পরদিন ধ্যানদাকে ঘটনাটা বলতে তিনি মাথা নাড়লেন, 'বেশ তো, উনিও চলুন।'  
শুধু উপন ঠোট টিপে হাসল। হাসিটাকে ভাল বলে মনে না হওয়ার মোহর কারণ জিজ্ঞাসা করল। উপন বলল, 'আমার সঙ্গে তো কেউ যাচ্ছে না। যাবে না কারণ আমি শিশু নই যে অন্যের সাহায্য দরকার হবে। তোর সঙ্গে যাচ্ছে কেন?'

ধ্যানদা বললেন, 'ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'  
উপনে বলল, 'তাহলে বড় বড় কথা বলা বন্ধ করতে বলুন।' বলে সরে গেল সেখান থেকে।  
মাথা নিচু করে বসে ছিল মোহর। ও যে নিছক একটি মেয়ে এবং তাই অভিভাবক ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয় এটা এখন প্রমাণিত। অন্তত বাবার সঙ্গে যাওয়াটাই তাই প্রমাণ করবে। একবার মনে হল সে ধ্যানদাকে বলে দেবে যে কলকাতায় যাবে না। কিন্তু সেটা বলার মত সাহস সে পাচ্ছিল না।

সেই রাতে মোহর অম্মদা মুখার্জিকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে যাচ্ছ?'  
অম্মদা মুখার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তুই একা থাকবি, কোনও কিছু যদি দরকার হয়—'  
'তার জন্য তো দলের ম্যানেজার হয়ে ধ্যানদাই যাচ্ছেন।' মোহর ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'উপেন তো একাই যাচ্ছে। ওর যদি বাবার প্রয়োজন না হয় তাহলে আমার হবে কেন?'

'ঠিকই। তবে আমি ভেবেছিলাম প্রতিযোগিতা হয়ে গেলে তাদের দল যখন চলে আসবে তখন তোকে নিয়ে আমি একটু ঘুরে বেড়াব। কলকাতার খবর নিতে হবে।'

'তাহলে মাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা যেদিন শেষ হবে সেদিন এসো।'

'তোর মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলি—'

'মোহর নামে যদি তোমার কোনও ছেলে থাকত তাহলে একথা বলতে?'

'যদি বলি বলতাম তাহলে মানতে চাইবি না। ঠিক আছে, গো অ্যাহভে!'

ধ্যানদার কাছে কলকাতায় যাওয়ার আয়ের দিন হটাৎই প্রাণেশ এসে হাজির। ধ্যানদা একটু অবাকই হয়েছিলেন, 'কি ব্যাপার প্রাণেশ, তুমি?'

'শুনলাম আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন কম্পিটিশনে?'

'হ্যাঁ। ছেলেরা তো যাকেমানে অভিজ্ঞতা পাওয়া দরকার।'

'ভাল। বলুন আমি কি করতে পারি?'

'তুমি কি করবে?'

'ধ্যানদা, একসময় আমি আপনার কাছে শিখেছি। অ্যাকসিডেন্ট না হলে আমি দূরে সরে যেতাম না। কিন্তু আমার সবসময় আপনারদের কথা মনে আসে। তাই দল নিয়ে যখন কলকাতায় যাচ্ছেন তখন আমি কিছু উপকারে লাগতে চাই। সবাই যাতে ওখানে ভালভাবে থাকতে পারে সেটা আমি দেখব। কত দিতে হবে বলুন।' প্রাণেশ বলল।

'তুমি টাকা দিতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু প্রাণেশ, এখন তো টাকার দরকার হবে না। যাযাত্যতের টিকিট হয়ে গেছে। আমরা থাকব উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনায়। ওরাই খাবার দেবে। কোনও খরচই হবে না। তুমি যে নিজে থেকে এগিয়ে এসেছ এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'ওখানে যেসব খাবার পাবেন তা বারোয়ারি খাবার। একটু স্পেশ্যাল করতে চাইলেই টাকা দরকার হবে।'

ধ্যানদা বললেন, 'দ্যাখো, উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই জানেন প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে মিনিমাম কি খরচের খাবার দরকার হয়। সেটা বারোয়ারি হলে আপত্তি কি। ধরো হলুদপুরের ফুটবল দলকে আই এফ এ শিল্ড খেলতে নিয়ে গিয়ে গ্র্যান্ড হোটেল যদি রাঁধি তাহলে ওরা কি সেমিফাইনালেও উঠতে পারবে? তবু তুমি বলছ বলে আমি খুশি।'

প্রাণেশকে ধ্যানদার সঙ্গে কথা বলতে দেখছিল মোহর। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল ওদের মধ্যে যদিও কোনও কগডামাটি হচ্ছে না কিন্তু ধ্যানদা বোম্বহ্ন কোনও কিছুতে রাজি হচ্ছেন না। প্রাণেশ উঠে দাঁড়াল। উপনকে কিছু বলল। তারপর মোহরের দিকে এগিয়ে এল, 'জিততে হবে কিন্তু। পাবলিক যেন হলুদপুরের নাম জানতে পারে।'

মোহর হাসল, 'চেষ্টা করব।'

'তাহলেই হবে।' হঠাৎ গলা নামাল প্রাণেশ, 'আমি নির্জন রাস্তায় অপেক্ষা করছি।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল।

ওকে চলে যেতে দেখল মোহর। আর সেইসঙ্গে আবিষ্কার করল প্রাণেশ সম্পর্কে তার মনে একসময় যে আকর্ষণটা উকি মারত সেটা এখন প্রবল হচ্ছে। প্রাণেশ মানেই এক রুক্ষ বন্য ব্যাপার। জীবনানন্দ দাস বা সাহিত্যশিল্পের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই। উপেন এসে বলল, 'প্রাণেশ টাকা দিতে এসেছিল।'

'কিসের টাকা?'

'আমাদের কলকাতার খরচ। ধ্যানদা নেয়নি।'

'ওর অনেক টাকা আছে, না?'

'থাকবে না। দুশস্বর কাঁদবার করে দিনরাত। মদ খায় খুব।'

মিনিট তিরিশেক বাদে মোহর প্রশ্নটা করল নির্জন পথে দাঁড়িয়ে, 'তুই মদ খাস?'

একটুও কুষ্ঠিত না হয়ে প্রাণেশ হাসল, 'খাই।'

'কেন খেতে রে?'

এবার যেন ফাঁপরে পড়ল প্রাণেশ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। তবে প্রথম কয়েক চুমুক ভাল লাগে না তারপর জমে যায়।'

'জমে যায় মানে?'

'মেজাজ খুলে যায় তখন খেতে খুব ভাল লাগে। তবে যেই বৃষ্টি আমার নেশা হয়ে যাচ্ছে তখনই যাওয়া বন্ধ করি। নো মোর।'

'কেন? মদ তো লোকে নেশা করার জন্যেই খায়।'

'তারা বোকা। নেশা হয়ে গেলে নিজের ওপর কন্ট্রোল থাকবে না। তখন যে যা খুশি করবে আমাকে নিয়ে। সেটা হতে দিচ্ছি না।'

অনিশ্চাসী চোখে তাকাল মোহর, 'ধ্যাত! এরকমভাবে নিজেকে সামলানো যায় নাকি?'

'একশোবার যায়। আমি কি পারি তা তুই জানিস না। খারাপ মেয়েদের পাড়ায় কতবার ফুটি

করতে গিয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের ছুঁয়ে দেখিনি।'

'তুই খারাপ মেয়েদের কাছে খাস?'



‘যাই। ওরা কোনও ভ্যানতারা করে না। সব খোলামেলা কিন্তু ওরাও জানে আমি অন্য কোনও ধন্দায় নেই। গান শুনব, মদ খাব, নাচ দেখব, ব্যাস।’

‘আমাকে একদিন নিয়ে যাবি?’  
‘হকচকিয়ে গেল প্রাণেশ, ‘তুই যাবি?’

‘তুই যা যা করিস তা আমি করতে পারি, শুধু মদ খাব না।’

‘কিন্তু মেয়েছেলারা ওখানে যায় না।’

‘আমি মেয়েছেলে নই।’

‘ও হ্যাঁ। সরি। কিন্তু দিনের বেলায় ওখানে কেউ যায় না। তাছাড়া রানীগঞ্জে যেতে আমার বাইকেও একঘণ্টার বেশি লাগবে।’ প্রাণেশ দ্বিধায় পড়ছিল।

‘ঠিক আছে। কলকাতা থেকে ফিরে আসি তারপর একটা রাস্তা ভাবব। আচ্ছা, তোর নাকি দুশ্চরিত্র কারবার করে অনেক টাকা হয়েছে?’

‘কোন শালা বলল?’

‘হ্যাঁ কি না তাই বল?’

‘টাকা আসে কিন্তু থাকে না; উড়ে যায়। কাগজগুলোর গায়ে ঘন ডানা লাগানো থাকে। এই দ্যাখ না, গত সপ্তাহেই হাজার দশেক কামাল।’ ভাবলো ব্যাঙ্কে ফিস্তি করে দেব। শালা পরদিনই খবর পেলাম মাসির ছেলেটার একটা বড় অপারেশন হবে। অবশ্য ওদের খারাপ তাই টকটাকা পাঠিয়ে দিলাম।’

‘যাক ভাল কাজে লাগল টাকটা।’

‘তাতে আমার কি উপকার হল।’

‘তুই আমাকে ডাকলি কেন?’

‘চলে যাবি তাই কথা বলতে হচ্ছে হল।’

‘সে কি? তোর সঙ্গে তো আমার কত বছর যোগাযোগ নেই। আর আগে তো তুই আমাকে মানুষ বলেই ভাবতিস না। তাহলে—?’

‘কি জানি। সব শালা উল্টো হয়ে যাচ্ছে। চল, বাইকে ওঠ, পৌছে দিচ্ছি।’

‘মোহর উঠল। পেছনে বসে বলল, ‘তুই যে দুশ্চরিত্র করিস, পুলিশ যদি ধরে?’

‘ধরবে না। পাটি পেছনে না লাগলে পুলিশ ধরবে না। পাটি রেগুলার মাল খায় আমার কাছ থেকে। নইলে পারলিক এত খাতির করত না আমাকে।’ পিপিড বাড়ল প্রাণেশ।

‘বাড়ির কাছাকাছি বাইক থামাল প্রাণেশ, ‘তোরা ফাদার আসছে।’

‘বাকের দেখে বাইক থেকে নেমে পড়ল মোহর, ‘ঠিক আছে।’

‘কটলোম। আর পিপিড তুলল প্রাণেশ।’

‘অমদা মুখার্জি সবিস্ময়ে সেইদিকে তাকিয়ে থাকলেন। মোহর তাঁর পাশে এল। তিনি মেয়ের মূর্খের দিকে তাকালেন, ‘এর নাম প্রাণেশ না?’

‘হ্যাঁ। মোহর বাবার পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারছিল না।

‘এর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?’ অমদা মুখার্জির কণ্ঠস্বর বেশ দুর্বল।

‘অনেক দিন আগে আলাপ হয়েছিল।’

‘অদ্ভুত। তুমি জানো ও দুববার ফেল করার পর পড়াশুনা ছেড়েছে? হলদুপুরের মামুষ ওকে শুণ্ডা বদমাশ বলে। শুনতে পাই ইলিজিয়াল উপায়ে টাকা রোজগার করে।’

‘তাহলে পুলিশ ওকে ধরছে না কেন?’

‘হ্যাঁ। ও। তুমি বুঝবে না কেন পুলিশ ওকে ধরছে না। কিন্তু ও একটি কালপ্রিট ছাড়া কিছু নয় আর তুমি ওর বাইকে চড়ছ?’

‘বাবা। ও কি করে আমি জানি না, তবে আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করে। আজ ধ্যানদার কাছে গিয়েছিল আমাদের কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে। ধ্যানদা নেননি। আর কেউ তো যায়নি।’

‘মোহর। চার্লস শোভরাজ নামে একটা বুনির নাম তুমি শুনেছ। তাকে বুন করতে চোখে দ্যাখোনি। এই মুক্তিতে কি তুমি শোভরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?’

‘ও। কিন্তু বাবা প্রাণেশ আমার বন্ধু না।’

‘তাহলে?’

‘শুধুই পরিচিত।’

‘অমদা মুখার্জি হাঁটতে আরম্ভ করলেন, ‘দ্যাখো, লোকে কি বলবে এই নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। তোমার ক্ষেত্রে আমার স্ট্যান্ড কি তা তুমি জানো। বাইরের মানুষ দুইয়ের কথা তোমার মায়ের আপত্তি আমি শুনি। তবে আমি এমন কাজ কখনও করব না যাতে আমার প্রিয়জন কষ্ট পায়। তুমি করবে কিনা তা ভেবে দেখো।’

‘ভেবেছিল মোহর। প্রাণেশকে তার বন্ধু বলে ভাবতে হচ্ছে করে না। ওর পড়াশুনা নেই, কথাবার্তা যে ঘরানায় বলে তাতে বেশিক্ষণ কথা চালানো যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রাণেশের বলা স্বভাবের জন্যে সে অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করে। এই আকর্ষণের কথা কাউকে সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। প্রাণেশকে দেখার জন্যে, কথা বলার জন্যে তার মন কখনই উন্মুখ হবে না। কিন্তু প্রাণেশকে চোখে দেখলে তার বিন্দুমাত্র খারাপ লাগে না। এখন মনে হচ্ছে তার একটা বাইক থাকলে ভাল হত।’

প্রতিযোগিতায় এসে ঝামেলায় পড়লেন ধ্যানদা। তিনি নাম পাঠিয়েছিলেন এবং তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের কোনও সন্দেহ হয়নি। দল নিয়ে আসার পর যখন তারা জানল মোহর মুখার্জি একটি মেয়ের নাম তখন তারা আপত্তি করতে লাগল। যেহেতু এবার মেয়েদের শাখায় প্রতিযোগিতা হচ্ছে না তাই মোহরকে বাতিল করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

‘ধ্যানদা তাঁর প্রতিবাদ করলেন। সার্কুলার দেখিয়ে বললেন কোথাও লেখা নেই যে প্রতিযোগিতা শুধু ছেলেদের জন্যে, মেয়েরা যোগ দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত মোহরকে মেয়ে হিসেবে গণ্য না করে প্রতিযোগী হিসেবেই দেখা উচিত যখন তার নামের এন্ট্রি ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে।’ অনেক আলোচনা এবং বিতর্কের পর মোহরকে অনুমতি দেওয়া হল। ধ্যানদা খবরটা দিয়েই মোহর তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তার মনে ছিল ফুটবল এবং জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলোর মত তাকেও এখান থেকে বিফল হয়ে ফিরতে হবে। সেটা যে হল না তা কেবল ধ্যানদার জন্যেই। প্রতিযোগিতায় নামবার আগেই যেন সে জিতে গেল।

‘শহর কলকাতায় পা দিয়ে থমকে গিয়েছিল মোহর। প্রথমই একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঢুকছিল। এই যে এত মানুষ পিলপিল করে ছুটে যাচ্ছে তাদের নিশ্চয়ই একটা করে বলিশ এবং বিছানা আছে নইলে রাতে তারা ঘুমায় কি করে? তাহলে কলকাতায় কত বলিশ বিছানার প্রয়োজন হয়? এত ধোঁয়া এত বিশৃঙ্খলতায় এখানকার মানুষ কি করে দিন কাটায়? কলেজে পড়তে তাকে এখানেই আসতে হবে। বাংলা সাহিত্যের যেসব গল্প উপন্যাসে তার কলকাতা সম্পর্কে জান লাভ হয়েছে তারের কোথাও শহরটার এই অসহ্য চরিত্রের কথা বলা হয়নি। বাসে উঠলেই বাবা যায় এখানকার মানুষ কি রকম নিশ্চয়। এই মোহরজনের জন্যে মোহর খুব কষ্ট পাচ্ছিল।

‘উদ্যোক্তারা তাদের রেখেছিল একটা হোস্টেলে। তিনজনের জন্যে একটাই ঘর। ভাণ্ডা ভাল বলে বাথরুমটা লাগেয়া। ধ্যানদা আর একটা ঘরের চেষ্টা করতে মোহর বলেছিল, ‘আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি বাথরুমে জামাপ্যান্ট ঢেঁক করে নেব।’

‘ধ্যানদা উপন্যাসের দিকে তাকালেন। উপন্যাস কোনও কথা বলেনি।

প্রথম রাউন্ডে নেমেই মোহর বুঝল দর্শকরা তাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। সে ছেলে না মেয়ে এই বন্দে পড়ে গেছে অনেকের। পোশাক এবং চুল কোনও হেলের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। কলকাতায় আসার সময় আর একপ্রস্ত চুল ছেঁটে নিয়েছিল সে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেও শরীরের আদল সর্বত্র বদল করতে সক্ষম হয়নি সে। দর্শকের কথা ভেবেই সে সপ্রতিভ হল। প্রতিপক্ষ তাকে বুঝে ওঠার আগেই সে হাল ধরে ফেলল। তার প্রতিটি শিরায় যেন খবর চলে গেল জিততে হবে। এবং এত দ্রুত যে তাকে জয়ী ঘোষণা করা হবে সে নিজেও কল্পনা করেনি। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার হাসি নিয়ে ধ্যানদার সামনে আসতেই প্রচণ্ড ধমক বেগে মোহর, 'অত ছোট্ট করাছিলে কেন? কাকে কি দেখাচ্ছিলে। মন ঠিক রাখো।'

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি মোহরের। তুলনায় প্রথম রাউন্ডে বেশ হিমসিম খেয়েছিল উপেন। জিতেছিল বেশ কষ্ট করে। ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গিয়েছে খুঁড়া প্রতিযোগিতায় ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাড়া দিয়ে জিতছে একটি মেয়ে। তৃতীয় রাউন্ডের শেষে খবরের কাগজের রিপোর্টার এল। ধ্যানদার অনুমতি নিয়ে মোহর তাঁদের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'আমি যা কিছু শিখেছি তা ধ্যানদারই শেখানো।'

'একজন মহিলা হয়ে আপনি অদ্ভুত কাণ্ড করছেন বলে মনে করেন না?'

'না। একজন মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক কাজই করছি।'

'কিন্তু মহিলাদের শরীরের গঠন তো ছেলেদের মতন নয়।'

'ঠিকই। কিন্তু যা আছে তাই নিয়েই তো বাচেনি পাল এভারেস্টে ওঠেন।'

'আপনার লক্ষ্য কি?'

'আমি মানুষ সোটা প্রমাণ করা।'

পরদিন মোহর হেরে গেল। এবারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অনেক অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। হেরে গেলেও তার লড়াই করার ধরন অনেকের ভাল লাগল। উপেনও হারল তবে কোয়ার্টার ফাইনালে। কিন্তু দলের এই পারফরমেন্সে ধ্যানদা অখুশি নন। বললেন, 'প্রথমবার এখানে এসে তোমরা যা করেছ তা যথেষ্ট। এই যে অভিজ্ঞতা হল তা পাবার কারে লাগাও।'

মোহর কিছু বলেনি। সে এখন অনুভব করছিল একটা অসম লড়াইয়ে ঢুক গিয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষের পক্ষে একটা বড় পর্যন্ত সম্ভব। সেই হুরে সে পৌঁছে গিয়েছে যা তাকে তৃতীয় রাউন্ডে এনে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে শরীরের কোনও ভূমিকা নেই, প্রকৃত যেখানে নিজস্ব সেখানে সে যে কোনও পুরুষকে অন্যায়সেই চ্যালেঞ্জ করত। পেরে। হালদপুরে ফিরে গিয়ে মোহর একদিন ধ্যানদার সামনে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'না।' ধ্যানদার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমি যদি আর কোনও প্রতিযোগিতায় না নামি তাহলে আপনি রাগ করেন?'

একটু ভেবে হেসে ফেললেন ধ্যানদা, 'হ্যাঁ, এই প্রশ্ন?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি এসব করছি আপনাকে কথা দিয়েছি বলে।'

'বেশ তো। তোর ভাল লাগলে আমি জোর করব না।'

'আপনি জিজ্ঞাসা করছেন না কেন আমার ভাল লাগছে না?'

'ইচ্ছে হলে বলতে পারিস।'

'তৃতীয় রাউন্ডে লড়াইয়ের আগে আমি অসুবিধায় পড়েছিলাম। প্রকৃতি মেয়েদের যে শাস্তি দেয় আমার তখন সোটা শুরু হয়েছিল অথচ আমার প্রতিপক্ষ পুরুষ বলে তার কোনও দৈহিক অসুবিধা হয়নি। ইটালি বা অনুশীলনে আমি ওই ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু রিঙে নেমে আমার মনের ওপর চাপ পড়ছিল। তার ফলে একটা অসুবিধে নিজেই তৈরি করে ফেলেছিলাম।'

'কথাটা তখন আমাকে বলিসনি কেন?'

'বলে কি হত? আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা বললে সবাই হাসাহাসি করত। আরও অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাত। ওরা নিশ্চয়ই চার দিন প্রতিযোগিতা বন্ধ করে রাখত না। আর যেয়ে বলে সোটা করলে তাই নিয়ে মস্করা শুরু হয়ে যেত।'

'তা হত। কিন্তু তুই নিশ্চয়ই আগেই জানতিস তোর শরীরের অবস্থা কখন কিরকম থাকবে, কলকাতায় যাওয়ার আগে এই ভাবনটা ভাবা উচিত ছিল।'

'বিশ্বাস করুন তখন মাথায় আসেনি। আর এখন মনে হতে পারে আমি নিজের হারের পেছনে একটা মুক্তি খাড়া করাছি শরীরের দেহায়ে দিয়ে। তাই আমি ভাবছি আর কখনও এইসব প্রতিযোগিতায় নামব না।' স্পষ্ট গলায় বলল মোহর।

'তাহলে এখানে আর আসছিস না?'

'না। আসব। আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে আসব।'

ধ্যানদা হাসলেন, 'তুই এখন গুছিয়ে কথা বলিস কি করে? বইপত্র পড়িস?'

মাথা নেড়েছিল মোহর, 'এমন কিছু নয়।'

নন্দিনী জঙ্কেট দিয়েছিল। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল সে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় মোহরের চেয়ে খুব বেশি নম্বর পায়নি নন্দিনী। মোহর যে প্রথম ডিভিসন পাবে তা অন্নদা মুখার্জি জানতেন। রেজাল্ট দেখে তিনি একটু চিন্তায় পড়লেন। প্রথম ডিভিসন হয়েছে কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির ব্যাপারে একটু দৃষ্টিশীল থাকল।

কলকাতার মুক্তারামবাবু ট্রিটে অন্নদা মুখার্জির কাকা থাকেন অস্ত্রলোকের বয়স আশি ওপরে। পুত্রদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তারা আলাদা থাকে। চিঠিপত্রে তাঁর সঙ্গে অন্নদা মুখার্জির যোগাযোগ আছে। তাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে অন্নদা মুখার্জি জবাব পেলেন, 'তোমার কন্যা আমার এখানে থেকে পড়শুনা করলে কোনও সমস্যা হবে না যদি সে এই শর্তগুলো মেনে চলে। আমি নিজে রান্না করে বাই। ভাত ডাল এবং একটু তরকারি। আমিষ বর্জন করেছে। আমার সঙ্গে খেতে গেলে তাকে ওই খাবার খেতে হবে। রাত নটার মধ্যে আমি শুয়ে পড়ি এবং তারপর আলো ছেলে রাখা পছন্দ করি না। আমার বাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারা চলবে না। তার কোনও কাজ আমার অপছন্দ হলে তাকে এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার বাড়িতে একটা রেডিও আছে সেটা প্রত্যাহ সবাদ শোনার জন্যে খোলা হয়। অন্য সময় গানবাঁজনা বাজানো চলবে না। এইসব কথা মনে রেখে যদি তাকে পাঠাতে হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

মেয়ে মাছমাংসভিন্ন খেতে পারে না বলে অন্নদা মুখার্জির স্ত্রীর আপত্তি ছিল কিন্তু কলকাতার মত অজানা বড় শহরে গিয়ে ওই বাড়িতে থাকলে যে মেয়ে নিরাপদে থাকবে তাতে কোনও সমস্যা না থাকায় দুপ করে রইলেন। হোস্টেলে জায়গা পাওয়া খুবই মুশকিল এবং অন্নদা মুখার্জি জানতেন প্রেসিডেন্সি কলেজের মেয়েদের জন্যে কোনও হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের জন্যে মুন্সীমেয় যেসব হোস্টেল আছে তাতে ভিড় উপচে পড়ে। অবশ্য মেয়ে যদি প্রেসিডেন্সিতে জায়গা না পায় তাহলে ব্র্যাবোনে যেতে হবে, এবং সেখানে হোস্টেলে ব্যবস্থা থাকায় মুক্তারামবাবু ট্রিটে যাওয়ার দরকার হবে না।

কলকাতায় যাওয়ার দুদিন আগে ধ্যানদার কাছে যাওয়ার পক্ষে প্রাণেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুর্বৃত্ত বাইকটাকে আচমকা ধামিয়ে হাসল প্রাণেশ, 'হেরে গেলি?'

বুকতে পারেনি মোহর, 'কিসে?'

'জুডোতে।'

'ওঃ হ্যাঁ। হারজিত তো আছেই।' মোহর মাথা নাড়ল, কোথায় ছিলি?'

‘বোম্বে গিয়েছিলাম। ওঠ!’

‘কেন?’

‘তোমার সঙ্গে কথা আছে।’

প্রাণেশের কথা বলার ভঙ্গি, বাইকের হ্যাণ্ডেল ধরা শরীরটার ছন্দ এমন একটা আকর্ষণ তৈরি করল যে চুপচাপ উঠে বসল মোহর। প্রকাশ্যে রাস্তায় তাকে প্রাণেশের বাইকে উঠে বসতে দেখে অনেকেই যে খুব অবাক হচ্ছে এটা বুঝতে পেরেও উপেক্ষা করল।

অনেকটা ছুটে এসে প্রায় হাইগুয়েটে গুটার আগে নির্জন একটা কালভার্টের ওপর বাইক দাঁড় করাল প্রাণেশ, ‘নাম।’

মাটিতে দাঁড়িয়ে মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘এখানে এলি কেন?’

‘বললাম না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।’ বাইকটাকে রাস্তার ওপর থেকে নামিয়ে নীচের ঢালু জমি দিয়ে ইটতে লাগল প্রাণেশ। এখানে অনেকটা মুনোচ্ছারে ভিড় এবং তার ওপাশে সামান্য জলাভূমি রয়েছে। সেখানে পৌঁছে মোহর দেখল ওপরের রাস্তা চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় নীচে মানুষ রয়েছে।

বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল প্রাণেশ, ‘রঞ্জনা তোমার বন্ধু না?’

‘রঞ্জনা?’ তোমার সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?’ মোহর অবাক হল।

‘হ্যাঁ। আমার কাছে রঞ্জনার লেখা পাঁচটা প্রেমপত্র আছে।’

মোহর হেসে বলল, ‘আচ্ছা!’

‘ক’থাটা তা নয়। রঞ্জনা অনেক ছেলেকে প্রেমপত্র লেখে, আমাকেও লিখেছে। কিন্তু ওর বাপ আমার পেছনে লেগেছে। রঞ্জনার মামা পুলিশের ডি আই জি। আমাকে ডাগ কেসে ফাঁসাবার তালে ছিল লোকটা। খবর পেয়ে আমি বোম্বে চলে যাই। কিন্তু আমি যদি এর বদলা নিই তাহলে কি অন্যায় হবে?’ শব্দ মুখে জিজ্ঞাসা করল প্রাণেশ।

‘কিভাবে বদলা নিবি?’

‘রঞ্জনাকে কদিনের জন্যে হাওয়া করে দেব। পাবলিক জেলে গেলে ফিরিয়ে দেব।’

‘তখন ডি আই জি চুপ করে বসে থাকবে?’

‘ডি আই জি-র বাপও ঝুঁজে পাবে না। তাছাড়া মেয়ে আমার সঙ্গে শুয়ে এসেছে জানতে পারলে ওর বাপের কিছু বলার মুখ থাকবে না।’

‘রঞ্জনা তোমার সঙ্গে যাবে?’

‘না। আমাকে কায়দা করতে হবে। এরকম হারামি মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।’

‘মুখ সামলে কথা বল প্রাণেশ।’

‘আচ্ছা!’ হারামিকে হারামি বলব না? প্রেমপত্রে লিখেছে তুমি আমার সব, আমার সব কিছু তোমাকে দিলাম। প্রত্যেকটা চিঠির নীচে নিজের লিপিস্টিক রাঙানো ঠোঁটের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে। অথচ দুদিন ‘ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু শুধু দুবার চুমু ছাড়া কিছু খেতে দেয়নি।’

প্রাণেশের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট।

‘তুই ওকে এখানে এনেছিলি?’

‘হ্যাঁ। এটা সেফ জায়গা।’

‘তোমার বাইকে তুলে এনেছিলি?’

‘হ্যাঁ।’ সরল গলায় জবাব দিল প্রাণেশ।

কিছুক্ষণ থেকেই মেজাজ তেতেছিল। রঞ্জনার লিপিস্টিক রাঙানো ঠোঁটের ছাপ অনেক অনেক বড়র আগে সে-ও পেয়েছিল। মেয়েটার ওই অভ্যাস পাশ্চাত্যনি। সে বলল, ‘তুই যা হচ্ছে কর, আমি চললাম।’

‘চললি মানে?’

‘তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে না।’

‘যাঃ শালা! আমি কি করলাম?’

‘তুই কি ভেবেছিস আমিও রঞ্জনা যে এখানে এসে তোকে চুমু খাব?’

‘আমি কি একবারও তোকে বলেছি?’

‘তাললে রঞ্জনাকে যেখানে এনেছিস সেখানে আমাকে অনিল কেন?’

‘বললাম তো জায়গাটা সেফ।’ হাসল প্রাণেশ, ‘তাছাড়া রঞ্জনার সঙ্গে যা করা যায় তোমার সঙ্গে তা করব কি করে?’

‘ভাব মানে?’

‘রঞ্জনা একটা মেয়ে। একেবারে মেয়েমানুষ। গায়ে পারফিউমের গন্ধ। নরম নরম শরীর। সবসময় সেই শরীরটাকে দেখাতে ভালবাসে। ওটাই ওর ক্যাপিটাল। পৃথিবীর সব পুরুষ এমন খাবার খেতে ভালবাসে।’ প্রাণেশের কথা শেষ হওয়ারমাত্র মোহর পা চালাল।

অপ্রস্তুত ছিল প্রাণেশ, উল্টে পড়ল একপাশে কিন্তু সেই অবস্থায় সে দ্বিতীয় আঘাতটাকে আটকে দিল। ‘আমার গায়ে হাত তুলেছিস মোহর, একবার ছেড়ে দিয়েছিলাম আজ তোমার ব্যারোটা বাজাব আমি। দেখি কোন বাপ তোকে বাঁচাতে আসে।’ উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করছিল প্রাণেশ। একটু দূরে সরে গিয়ে মোহর বলল, ‘যাঃ যাঃ। ওরকম কথা শুণ্ডাদের গিয়ে বলবি। মেয়েমানুষ তোদের খাবার, বলতে বলতে কি বলছিস তা আর ভাবিস না।’

প্রাণেশ উঠে দাঁড়াল এবং চকিতে তার প্যান্টের পায়ের দিকের পকেট থেকে একটা সরু ছুরি বের করে ফেলল, ‘তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। পেছন ফিরে দাঁড়া।’

ছুরিটা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল মোহরের। ছুরি হাতে যারা আক্রমণ করতে আসে তাদের সামান্যনোর কায়দা তার জানা আছে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রাণেশের মুখের চেহারা প্যান্টে গেছে। এই মুখ বেপরোয়া ভাবে আহত করতে পারে, তেমন ব্যবসে বুনও। মোহর সতর্ক গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই কি করতে চাইছিস? আমাকে ছুরি মারবি?’

‘না। কেটে দেব। তোমার পিঠে দু দুটো দাগ এমনভাবে কাটবে যে জিন্দেগিতে মুছেব না।’ প্রাণেশ হাত সহকারে কথাগুলো বলামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহর। ঠিক কোনখানে আঘাত করল ছুরিটা তুই থেকে বসে যাবে তা সে জানে। কিন্তু এবার প্রাণেশ সতর্ক ছিল। চকিতে হাত সরিয়ে নিয়ে জাপটে ধরল সে মোহরকে, ‘তুই ভুলে যাচ্ছিস আমিও অনেকদিন জুতো শিখেছি। এখন সোনামি, আমাকে কাজটা করতে দাও।’ বলতে বলতে সে ছুরির ডগা দিয়ে আলতো করে মোহরের পিঠে চাপ দিল। যন্ত্রণা করকিয়ে উঠল মোহর।

‘আহা। লাগছে? এই জেলায় কোনও শালা আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না আর তুই হরিদাস, ঠিক আছে, জামা কাটবি না, খোল জামা—।’

‘না আমি জামা খুলব না।’

আবার চাপ দিল প্রাণেশ, ‘খুলবি না চালাব?’

‘তুই আমার পিঠে কাটবি?’

‘হ্যাঁ।’ ঠোট মুড়ুল প্রাণেশ, ‘তবে পিঠ দেখার পর নাও কাটতে পারি। তোমার পিঠ নিশ্চয়ই মেয়েদের মত নরম নয়? খোল।’

আদেশ মান্য করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। প্রাণেশ আঘাত করার দূরত্বে থেকে ওকে ছেড়ে দিতেই মোহর ধীরে ধীরে বোতাম খুলতে লাগল সার্টের। সেক্ষেত্রে এক হাতে নিম্নোক্ত ‘তুই এর জবাব পারবি।’

প্রাণেশের নজর এখন মোহরের নিটোল পিঠের চামড়ায়। উল্টো দিকে মুখ করে মোহর দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ব্রায়ের ক্রিপটাও সাদা। আর তার ঠিক নীচে এক কেঁটা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। ছুরির সামান্য চাপেই ওই অবস্থা। হঠাৎ রক্তটা দেখতে দেখতে শিহরিত হল প্রাণেশ। ধীরে ধীরে মোহরের পেছনে এসে দাঁড়াল সে। মোহর চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সামান্য নিচু হয়ে ওই রক্তবিন্দুতে ঠোট ছোঁয়াল, ঠোটে তুলে নিতে চাইল আঘাত চিহ্ন।

ঠোটের স্পর্শ পাওয়ায় মোহরের মনে হয়েছিল ছুরি বসানো প্রাণেশ কিন্তু ভুলটা বোঝামার তার সমস্ত শরীর বিমব্রিম করে উঠল। মুহূর্তে সব শক্তি উধাও। এখন প্রাণেশ তার পিঠে একটার পর একটা চুমু খেয়ে চলেছে আর মোহরের মনে হচ্ছে তার অজ্ঞান অনেক অনেক দরজা, একের পর এক খুলে যাচ্ছে। এভাবে আকাশের নীচে নমু হয়ে সে কখনও দাঁড়িয়ে থাকেনি আর এরকম সুখানুভূতি তার কখনও হয়নি।

এই দিনটির কথা কোনও দিন ভুলতে পারবে না মোহর। পরে, অনেক পরে এই নিয়ে সে অনেক ভেবেছে এবং যে ব্যাখ্যা পেয়েছে তা পাঁচজনের বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুশকিলাট হল পাঁচজনকে উপেক্ষা করে জীবনযাপন করা যায় কিন্তু সত্যি যা তাকে পাঁচজন স্বীকার না করলে অস্বস্তি হয়।

যতই আত্মবিশ্বাস থাক, স্বীকৃতি পেলে ভাল লাগে।

প্রাণেশকে তার যেভাবে পছন্দ হয়েছিল তা সারাজীবন বেয়ে বেড়ানোর মত নয়। ওর কথা আলাদা করে কখনওই মনে পড়ত না বা পড়ে না। ওর মধ্যে যে বন্য আকর্ষণ ছিল তা শুধু ওকে দেখার পরই অনুভব করত মোহর। সেই ঘটনার পর প্রাণেশের সঙ্গে আর দেখা হয়নি এবং দেখা করার জন্য লালায়িত হয়নি মোহর। হলুদপুরে গিয়ে শুনেছে পুলিশ কেসে কেঁসে গিয়েছে প্রাণেশ। এবার আর ছাড়া পায়গোর কোনও উপায় নেই। শুনে একটু দুঃখিত হয়নি সে। এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। যে ছেলে রিকলবার এবং ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার অন্য পরিণতি হওয়ার কথা নয়।

অথচ সেদিন সে প্রাণেশের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল এটা খুবই সত্যি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে নির্জন গাছগাছালির মধ্যে প্রাণেশ তাকে প্রাকৃতিক শিক্ষা দিয়েছিল। দেওয়া হয়ে গেলে বেশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আই, তুই এর আগে এসব করেছিস?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়েছিল মোহর, 'নেভার!'

'গুল মারছিস। তুই শালা ছেলেরের চেয়ে বেশি।'

কথাটা বলে কি বোঝাতে চেয়েছিল মোহর জানতে চায়নি।

'রেডি হয়ে নে।'

হয়েছিল। বাইকে ওঠার সময় হঠাৎই প্রাণেশ বলেছিল, 'তোকে একটা কথা বলছি। শরীরে কোনও অসুবিধে হলে আমার কাছে চলে আসবি।'

'কি অসুবিধে?'

'এসব করলে মেয়েদের যা হয়। সামনের মাসেই বুঝতে পারবি আর তখন দেরি করবি না। আমার হাতে ভাল ডাক্তার আছে। কেউ জানতে পারবে না।'

মোহর কথা বলেনি। তখন অতশত ব্যাপার নিয়ে ভাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। বাইকের ইঞ্জিন চালু করে প্রাণেশ বলেছিল, 'আর একটা কথা তোকে বলা উচিত। যদি দেখিস জ্বালা করছে, ঘামাটির মত বেরিয়েছে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করবি। আমার কাছে ওষুধ আছে, সেরে যাবে, ভয়ের কিছু নেই।' বাইক চালাল প্রাণেশ।

'ওসব হবে কেন?' প্রথম প্রশ্ন করল মোহর।

'হবেই যে তার কোনও মানে নেই। হতে পারে। অসুখটা আমি পেয়েছিলাম রানীগঞ্জের একটা বাজারি মেয়ের কাছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, খুব ভুগিয়েছিল। তারপর বোম্বে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করিয়ে ঠিক হয়েছি।' মাথা নাড়ল প্রাণেশ।

প্রাণেশ ঠিক কি বলতে চাইছে তা মোহরের মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু প্রাণেশ তার সঙ্গে যা করেছে তা একটা বাজারি মেয়ের সঙ্গে অবলীলায় করেছে জানার পর শরীর গুলিয়ে উঠল। মনে হল বমি হবে। সে বাইকটাকে দাঁড় করাতে বলল। অবাক হয়ে প্রাণেশ দাঁড় করিয়ে বলল, 'কি হল?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে রাস্তার পাশে চলে গেল মোহর। বমিভাব প্রবল কিন্তু সেটা বেরিয়ে আসছে না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ফিরল। শান্ত গলায় প্রাণেশকে বলল, 'তুই চলে যা। আমি যাব।'

'ইচরি? এখান থেকে অনেক দূর।'

'সেটা আমি বুঝব।'

'তোমার মাথাখারাপ হয়ে গেল নাকি? ন্যাথ মোহর, আমি তোকে আলাদা চোখে দেখি। অন্য কোনও মেয়ে হলে আমি এসব বলতাম না। আমি তোর ভাল করতে চেয়েছি আর তুই সেটাকে খারাপভাবে নিছিস।'

'আমাকে একা হাঁটতে দে গ্লিভ!'

প্রাণেশ কীধ ঝাঁকাল কিন্তু কথা বাড়াল না। বাইক নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। হাইওয়েতে ওর শরীরাটা বিন্দুর মত হয়ে গেল বমিটা এল। খানিকটা জল বেরিয়ে যাওয়ার পর স্বস্তি হল।

এই মুহূর্তে কোনও সুখানুভূতি নেই। বরং অজুত এক ধরনের আশঙ্কা ধীরে ধীরে চেপে বসছিল। হাঁটতে হাঁটতে মোহরের মনে হল এরকম একটা বিচ্ছিন্ন আনন্দদায়ক কাজের পর মেয়েরাই আইনি অথবা বেআইনিভাবে মা হয়ে যায় অথচ পুরুষেরা নিরাপত্তা থাকে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত কোটি প্রতিবাদ করেও এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় যদি না মেয়েটি আগে থেকে সচেতন থাকে। আর অসুখ? বাজারি মেয়েটি প্রাণেশকে অসুখ দিয়েছে সে ওটা মেয়েছে নিশ্চয়ই। কোনও পুরুষের কাছে। সেই পুরুষটির অবশ্যই আর এক নারীর দান। ডিম আপো না মুরগি, এ নিয়ে তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি প্রাণেশের ছড়াণা অসুখ তার শরীরে ডালপালা ছড়াতো থাকে তাহলে সে কি করতে পারে। ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকে কতকিছর করতে চাইছিল সে।

দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস এল। ততদিনে কলকাতার কলজে ভর্তি হয়ে গিয়েছে মোহর। তার সমস্ত দৃষ্টিক্তার অবসান ঘটিয়েছে প্রকৃতি। এবং এই কাটা দিন সে প্রতিটি মুহূর্তে প্রাণেশকে স্মরণ করেছে, গালাগালি দিয়েছে এবং সেটা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য পাল্টে স্টিকিয়ার্ট চৌদ্দপুরুষকে সংকার করেছে। মিলিত কর্মের দায়িত্ব কোন নারী একা বহন করবে। সে স্বীকার করতে বাধ্য মেহেতু এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই এবং যারা গিয়ে পড়ে দিতে আসেন তাঁদের দেবার যোগ্যতা নেই তাই এ নির্ণে মাথা ঘামানো নিরর্থক। পৃথিবীতে জন্মালে কিছু জিনিস মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক, কোনও যুক্তি সেখানে অচল, এভাবেই ভাবা উচিত। উচিত কিন্তু জ্বালা আসে মনে।

সেই বিকেলের অভিজ্ঞতার জন্যে কোনও গ্লানি নেই মোহরের মনে। ঘটনটা ঘটেছিল হঠাৎই, ঘটার সময়ে মনে গ্লানি ছিল না বরং অদ্ভুত একটা সুখ পেয়েছিল শরীর এবং তারপর ঠোঁট আর কোনও উঠে তোলেনি। ছায়া, দিন পঁচিশেক মন বিক্ষিপ্ত ছিল, এটা ঠিক। গম্প উপকর্ণ যখন এরকম ঘটনা ঘটে তখন লেখকরা দুজনকে প্রেমের বন্ধনে অথবা প্রেমের ডানে জড়িয়ে রাখেন। শাখাসিদুর যেমন বিবাহিতা মহিলাদের পাশপোটে তেমনি অবিভাতিতাদের প্রেম। অখণ্ড প্রাণেশের সঙ্গে তার কোনওরকম প্রেম হয়নি। প্রেম না হলেও যে সে আনন্দ পেয়েছে। এটা কিন্তু অস্বাভাবিক। যে ঘাই বলুক কৃতকর্মের জন্যে তার কোনও আক্ষেপ নেই।

তবে ভয় আছে। আজ পর্যন্ত সে যা শোনেনি, কোনও বহুত যা পড়েনি তা প্রাণে তাকে বলে গেছে। খারাপ পাড়ায় গিয়ে তার শরীরে রোগ এসেছিল তাই সে খুব স্বাভাবিক গলায় মেহেরকে সতর্ক করে গেছে। তখন রাগ এবং ঘোঁড়া হলেও পরে প্রাণেশকে তার খুব ভাল লেগেছিল। এই ভাল লাগা সত্য উচ্চারণ করার সাহসের জন্যে, প্রেম থেকে নয়।

জীবন যখন পাশটোলো না তখন আর অতীত নিয়ে ভাবনায় কি লাভ। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে নিলে কেন হয়? সর্দি কাশির বাড়বাড়ির জ্বর অথবা ম্যালেরিয়া হ্যাঁচাই করতে রক্ত পরীক্ষা করতে সে পেয়েছে কিন্তু যৌন রোগ আছে কি না। এটা যাচাই করতে হলে কি বলা দরকার তা সে জানে না। ডাক্তারকে গিয়ে বলা যায় ব্যাপারটা, কিন্তু বলাতে অস্বস্তি হচ্ছে। কলকাতার দেওয়ালে ছোট ছোট পোস্টারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যে, শহরীনারগের গোপনে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু মাংশ্যরমণাইয়ের রক্ত শিরায়া থাকায় ওসব জায়গাটা যাওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি। মোহর ভেবে নেয়, কিছু হবার হলে এতদিনে হয়ে যেত। কোনও ইন্ডেক্সকেশন দীর্ঘদিন চাপা থাকে না। যে সব প্রতিক্রিয়ার কথা প্রাণেশ বলে গিয়েছিল তার কোনও কিছু শরীরে দেখা যায়নি। এমন হতে পারে প্রাণেশ তাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলে গেছে। শরীরে কিছুই না বসিয়ে মনে আতঙ্কের ছল ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। মোহর এইরকম ভাবার পর এতটুকু একটু করে হাসা হয়ে গেল।

অমরা মুখার্জির কাকাকে দাদু বলে ডাকতে অসুবিধে হয়নি মোহরের। অমরলোকের চেহারা স্যার আশুতোষের মত। যেমন বপু তেমন সাদা গোঁফ কিন্তু চুল কালো। অমরলোক যে প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে মাথায় রং মাখনে তা বুঝেছিল কিছুদিন পরে। অমরা মুখার্জি নিজের মতো করে নিয়ে এসেছিলেন মুক্তারামবাড়ি ছিটে। তার কাকার নাম গোলকপতি ব্যানার্জি। বাঁ দিকের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে জি পি ব্যানার্জি।

মেয়েকে ভাল করে বুঝিয়ে গিয়েছেন তিনি। কলকাতা শহরে বিনিপয়সায় খাবার দিতে পারা ভাগ্যের কথা। মোহর যে আশ্রয়টা পাচ্ছে তা যেন হঠকোঁরাত্য না হওয়ায়। গোলকপতি যখন বিনা পেনা প্রতিবাদে মন্য করে সে। বন্ধ মানুষের সব কথা যে যুক্তিসঙ্গত হবে তার কোনও শিষ্টাচার নেই কিন্তু তাই নিয়ে যেন মুখে মুখে তর্ক না করে। গোলকপতি অমরা মুখার্জিকে বলেছেন খাওয়ার জন্যে তাঁকে কোনও টাকা দিতে হবে না। নিরামিষ খাবারের জন্যে তাঁর তেমন কিছু অর্থ ব্যয় হবে না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পৌছাতে মিনিট দশেক লাগে। যেতে আসতে ঠনঠনের কালীবাড়ি পড়ে। সেখানে সকাল বিকেল ভক্তদের ভিড় জমে। কৌতুহলী হয়ে একদিন মাঝের সামনে গিয়েছিল মোহর। কালীচাঁকুরের মুখের দিকে তাকালেই তার মনে যা যদি জিভাভুক্ত মুখের মতো ভেতর ঢুকিয়ে কেলেদে তাহলে তাকে কিরকম দেখাত। এমন সুন্দর শরীর খাঁর, মুখের গড়ন ও এত নিখুঁত যে বাকি দুহাত খসে গেলে সৌন্দর্য কেউ ধারেকাছে আসতে পারত না। একটা নন্দন। এটা তার মাথায় এল। যাকে এইভাবে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তবির করা এবং সেই মূর্তি পূজা করা করার পছন্দে মুক্তি কি? যুক্তিক্রমে যা পাগলিনীর মত যুক্ত করতে করতে বেয়াল করলেন তাঁর পোশাক খুলে

গেছে। তিনি চাঁক করে কোমরে কিছু নরমুণ্ডকে মালা করে জড়িয়ে নিলেন লজ্জা নিবারণ করতে। ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্য। যেহেতু দুর্গা লক্ষ্মী শাড়ি পরতেন তাই ঘরে নেওয়া যেতে পারে কালীর পাশা শাড়িই ছিল। শাড়ির নাচে পেটিকাট থাকত। অথবা সেইসময় সেমিজ। ধরা যাক সেমিজের চল ছিল না কিন্তু একটা কিছু অন্তর্বাস নিশ্চয়ই থাকত। শাড়ি খুলে পড়ে গেলেও সেই অন্তর্বাসের বাইনও খুলবে এমনটা বিশ্বাস করা যায়? মাথা যতই গরম হোক মেয়েরা এসব ব্যাপারে খুব সেন্সিটিভ হয়ে। যিনি প্রকৃত কালীকে ওই রূপে ভেবেছিলেন তিনি কেন যৌবনের এত বাড়বাড়ি কল্পনা করলেন? ওই কল্পনার পেছনে কি কোনও কারণ ছিল? সেসময় মেহেরের নরমুণ্ড দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। সংসারের সব কাজ সেরে মধ্যরাত্রে অন্ধকারে শত্রীকে পাশে পেতে তখনকার স্বামী। সেই অবদমিত কামনাই কি অন্য চেহারায়া প্রকাশ পেয়েছে? কালীমূর্তির যেসব ব্যাখ্যা চালু আছে তা ভক্তদের শ্রদ্ধাপ্রসূত। মোহরের মনে হল কালীচাঁকুরের অন্য ব্যাখ্যা ছিল। সেই বিব্রাহ প্রকৃতির বিরুদ্ধে। জেনেগুনেনি তিনি নগ্নিকা হয়েছেন। যে নগ্ন নারীমূর্তি দেখলে পুরুষের কামভাব জাগে সেই মূর্তিতেই তাদের ভীত করতে চেয়েছেন তিনি। যে পুরুষেরা নারীকে ভোগ করাই একমাত্র কর্ম বলে মনে করে তাদের মুণ্ড দিয়ে তিনি নিজের লজ্জা নিবারণ করেছেন। এ প্রতিবাদ হচ্ছে না। তিনি যদি জিত না বের করতেন তাহলে পুরুষেরা তাকে ছিড়ে যেত। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন নারী টিরকাল জিভের ব্যবহার করুক। মুখ বুজে বুজে নারী পুরুষকে দুঃস্থান হবার সুযোগ দিয়েছে। মুখ খুললে সে ভাতা পায়ের তলায় জমি পারে। সেই জমি 'সুন্দর' হলে তো থাকই নেই। অথচ না কালীর এই প্রতিবাদী চরিত্র বদলনলার্য বুঝতেই পারেনি। যিনি মাকে এভাবে কল্পনা করেছিলেন তিনি কি একজন পুরুষ? মোহর সঠিক জানে না। কিন্তু প্রথা ভাঙতে পারা সেই মানুষটি অবশ্যই নমস্যা।

মোহরকে দোতলার কাছের ঘরে থাকতে দিয়েছেন গোলকপতি। এবাড়িতে দুটি কাজের মানুষ আছে। একজন পুরুষ, সে বাহিরের কাজকর্ম করে। দ্বিতীয়জন মহিলা। তার বয়স হয়েছে, বাতে পঙ্গু। এককালে এবাড়িতে ঢুকেছিল বলে আর বের হয়নি। কাজের লোকটি তাকে রান্না খাবার দেয় বলে বেঁচে আছে।

অমরা মুখার্জি হলদপুরে ফিরে গেলে এক সকালে গোলকপতি মোহরকে ডেকে পাঠালেন। দ্বিতীয়বার মোহর গোলকপতির বৈঠকখানায় ঢুকল। চারদ্বারে খুব দামী দামী জিনিসপত্র সাজানো। অবশ্য তাদের চেহারা মোটেই আধুনিক নয় কিন্তু চেয়ে থাকতে হয়।

গোলকপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে তোমার কেমন লাগছে?'

'ভালই'

'খাওয়া দাওয়া?'

'আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

'হাবা অবশ্য থাকবে না। আমি যদি নিরামিষ খেতে পারি তুমি পারবে না কেন? তুমি কি শাড়ি পরো না?' গোলকপতি সাদা গোঁফে আঙুল বেলাচ্ছিলেন।

'না।'

'কেন?'

'আমার পছন্দ হয় না। অভ্যাসও নেই।'

'বাতালি মেয়ের মুখে এমন কথা মনায় না।'

'তাহলে তো বাতালি ছোলেদের মুখি পরতে হয়।'

গোলকপতি অবাক চেখে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'যাও।'

মোহর চলে আসছিল। অমরা মুখার্জি কলকাতা সড়কে কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কি করা যাবে। গোলকপতি পছন্দ থেকে ডাকলেন, 'শোন। আমার দুটি পুত্র আছে। তারা একালকৃষ্ণাও। তোমাকে বিরক্ত করতে পারে। করলে আমাকে বোলা।'

গোলকপতি অন্নদা মুখার্জিকে লিখেছিলেন তিনি নিজে রান্না করে খান এবং সেই রান্নাই মোহরকে খেতে হবে। দুবেলা খাওয়ার সময় কাজের লোকটি তাকে পরিবেশন করে। ভাত ভাল ভাজা তরকারি এবং দুধ। শেষ পদটি খায় না মোহর। দিনরাত্তে এক মনে। একজন বৃদ্ধ যে এসব রান্না করতেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসা করার বিষয়। কোনও দিন প্রশ্ন করেনি সে। কোথায় কোন ঘরে বসে গোলকপতি এসব রান্না করতে যান তা জানতেও চায়নি।

সকাল বিকেলে যাওয়া আসার সময় মোহরকে গোলকপতির বৈঠকখানার সামনে দিয়ে পা ফেলতে হয়। দরজার কাছে ইঞ্জিনের পেতে বসে থাকেন বৃদ্ধ। কোনও কথা হয় না। এই বিশাল বাড়িটিতে দিনভর পায়রা ডেকে যায়। সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছায়ায় মাথামাখি হয়ে। এরকম বাড়ির দোতলার কোণের ঘরে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না মোহরের। এই প্রথম বাবামাকে ছেড়ে একা রয়েছে সে। প্রথম দিকে খুব একা লাগত। হলুদপুরে দুটিতে চিঠি পরপর লেখার পর মনে হল একই কথা লিখছে। পাঁচপার স্থির হয়েছিল সে।

মুন্সীরামবাণু স্ট্রিট থেকে কলেজে গোলগার রাস্তাটা গুলিয়ে ফেলার কোনও উপায় নেই। ভিড়ে ভর্তি এবং ভাঙাচোরা পথটায় ইটা সুখরক নয়। বরং কলেজের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে ভাল লাগে। এখন কলেজে তেমন জোয়ারো কোনও আন্দোলন হচ্ছে না। পড়াশুনার আবহাওয়া পুরোপুরি। কলেজে মোহর দেখল তার মত সার্ট প্যান্ট পরা মেয়ের সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই অবশ্য শালায়ার কামিজ অথবা স্কার্ট কিন্তু জিনসের পায়ের দিকে ঝাঁক তুলে অনেকেরই আসছে। এদের কেউ কেউ তার চেয়ে বেশি নম্বর পেলেও যে কিনিসটা সে টের পেল তা হল হলুদপুরে মানুষ হবার কল্যাণে কথাবার্তায় ইটাচলায় তার মধ্যে যেন একটু মফস্বলি গন্ধ রয়ে গেছে। এদের অনেকেরই তার থেকে বাইরের জগতের খবর অনেক বেশি জানে।

তুলনায় ছেলেরা যেন অনেক সহজ। তুই তোকারিতে মোহর অভ্যস্ত। এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে ছেলেরের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তৃতীয় দিনেরই সে কয়েকজনের সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে কফি হাউজে গেল। বিশাল হলঘরে গমগমে শব্দের মধ্যে কোণের টেবিলে বসে গুঠাং গ্যানদার কথা মনে পড়ে গেল। গ্যানদা চাইতেন সে নিয়মিত অনুশীলনের মধ্যে থাকুক। গ্যানদা বলেছিলেন, 'বাঙালি মেয়েদের কি গোলমাল জানো, অস্পর্ষসে তারা যা শেখে তা বেশিদিন আঁকড়ে ধরার তাগিদ বোধ করে না। যে মেয়েটি খুব ভাল কবচ নাচত পনেরো বছর বাসে, তাকে পঁচিশে দেখবে মোটোসাঁই হয়ে গিয়েছে। নাচের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। যুঁটি যেটা শিখেছে সেটা চায় না থাকলে জং পড়তে বাধ্য। আর তা হল নিজেদেরই প্রশ্ন করে এত কষ্ট করে শেখার কি দরকার ছিল।'

অনিদার্যার যে কথা থামিয়ে তাকে দেখছে বুঝতে পারেনি মোহর। হঠাৎ একটা হাত মুখের ওপর গুঠানামা করতেরই সচেতন হল সে। অনিদার্য হাসল, 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি!'

'সোজা হল সে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, মানে—'

'বাড়ির কথা মনে পড়ছে?'

'না। আমি একজনের কাছে জুড়ো শিখতাম। মানুষটা একদম আলাদা ধরনের।'

'জুড়ো শিখতিস? তুই?'

'কেন? অবাধ হবার কি আছে?'

'কেউ যদি অ্যাটাক করে তাহলে নিজেকে ইচ্ছাতে পারবি?'

'যদি সে আমার চেয়ে ভাল জুড়ো না জানে তাহলে পারবে।'

কথাবার্তা অন্যদিকে ঘুরে গেল। মোহর আবিষ্কার করল জুড়ো ক্যারাতে কুয়ে সম্পর্কে এরা অনেককিছু জানে। সৌমিত্র তো বিশ্বাত্তমের নাম বলে দিল। তারপর বুসলি এবং বুসলি থেকে সিনেমামা চলে গেল আলোচনা। কিন্তু ওরা যে তাকে আলোনা চোখে দেখছে তা টের পাচ্ছিল সে।

খবরটা কলেজেও ছড়িয়ে গেল। কলেজের একটি মেয়ে গণবাবের জুড়ো প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিল এটা যেন গর্বের ব্যাপার। সিনিয়র ছাত্ররাও যেতে সম্মত করে কথা বলে

যাচ্ছে তার সঙ্গে। সুজান নামের একটি মেয়ে একদিন এল মোহরের কাছে। কলেজের মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল মোহর। সুজান খার্ড ইয়ারের ছাত্রী, লম্বা, সুন্দরী হিসেবে নিজে বেশ সচেতন। বৈদেশি গাড়িতে কলেজে আসে। হাতে সোনার চেন, চুল কখনও বাঁদে না অথচ বেশগুলো বেশ মায়াময় হয়ে পিঠে ছড়িয়ে থাকে।

'তুমি মোহর?' সুজান জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নেরে নিব্বশ্বে ই্যা বলল মোহর।

'তুমি জুড়ো জানো?'

'খুব সামান্য।'

'আমাকে কোচ করবে?'

'কেন?'

এমন প্রশ্ন বোধহয় আশা করেনি সুজান। বড় চোখে মোহরের দিকে তাকিয়ে আলাতো হাসল, 'তুমি বোধহয় আমাকে চেনো না। আমি এবার মিস ক্যালকাটা নামছি। মডেলিংয়ের অফার আছে প্রচুর।'

'এর সঙ্গে জুড়ো শেখার কি সম্পর্ক?'

'ওয়েল। ধরো, নিজেকে বাঁচাতে চাই।'

'তুমি তো রাস্তাঘাটে হাঁটো না। অজ্ঞানো বাজ্জে লোকের পাশায় পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। যারা তোমার আশেপাশে আসবে তারা তো বেশিবে এক ক্লাসের মানুষ। তারা নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদে ফেলবে না।' মোহর হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

সুজান মাথা নড়ল, 'পুরুষমানুষ একলা হলে তাদের কোনও ক্লাস থাকে না। আমি স্থিতিয়ার কাজে অনুরোধ করি না। অবশ্য তুমি মনে কোরো না আমি তোমাকে এমন পরিশ্রম করাব। সুগাছ একদিন মাসে চারশো টাকা দেবে।'

মুখের ওপর না বলে দিতে গিয়ে হঠাৎই সামলে নিল মোহর। অনেকেই তো অনেক কিছু করে রোজগারের জন্মে। চারশো টাকা মাসে পেলে হলুদপুরের ওপর চাপ কম পড়বে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'সন্টলেকে। আমাদের ডাইভার তোমাকে নিয়ে আসবে, পৌঁছে দেবে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একমাস পরে যদি দেখি তুমি ইন্সপ্ত করছ না তাহলে—'

'আমিই তোমাকে নিশ্চুতি দেব।'

কলকাতার কিছু মানুষ কি বিপুল বৈভবের মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন তা সুজানের বাড়িতে দেখতে পেল মোহর। প্রথম দিন, সেটা রবিবারের বিকেল, গাড়ি থেকে নামতেই দারোগ্যান গেট খুলে দিল। বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। নীচের বসার ঘরটির সাজগোজ দেখে বোঝা যায় বিত্ত এবং ক্রটি এখানে বিলম্বিত হয়েছ। নইলে এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরল ছবি ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত জুড়ে থাকুক না। কাজের লোক তাকে দোতলায় নিয়ে যাওয়ার সময় পাশের ঘর থেকে গলা ভেসে এল। কাজের লোক বলল, 'দিদিমণির কাছে এসেছেন!'

'এঘরে এসো ভাই।'

অতএব মোহর পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। গোল টেবিলের ওপর তাসের স্তুপ এবং তার চারপাশে জনা পাঁচেক মধ্যবয়সী বসে আছেন তাস হাতে। দশটি চোখ এখন তার ওপর। মোহর দেখল লম্বা লম্বা গ্রাসে পানীয় রং ছড়াচ্ছে। পাঁচজনের গায়ের রং খুব ফর্সা, ব্লাউজের কাপড় সংকীর্ণতম। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাকছেন?'

'তুমি মোহর? সুজান তোমার কথা বলেছে।' মোটোসাঁই মহিলা এবার পাশবর্তিনীদের দিকে তাকালেন, 'সুজানের সঙ্গে পেরে, জুড়ো জানে।'

‘মাই গড!’ একজন চোখ বড় করলেন।

‘ঠিক আছে, ওপরে যাও।’ সুজানের মা মাথা নাড়লেন।

এবাড়ির দোতলার ছাদে বাগান আছে, ঘাসের লনের পাশে একটা মিনি সুইমিংপুলও। সুজান যে এর মধ্যেই জুড়োর পোশাক কিনে ফেলবে তা আশা করেনি মোহর। ওকে সেই পোশাকে দেখে মোহরের মনে হল মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। রঞ্জনার সৌন্দর্য একরকমের ছিল কিন্তু সেটা সুজানের ধারে কাছে আসে না। ভাল পড়ুয়া হলেও জুডো-ছাত্রী হিসেবে সুজান খুবই নিম্নস্তরের। শরীর ঠিক রাখার জন্যে দু-একটা আসন আর ডায়টিং করা ছাড়া কখনই কোনও খেলাধুলা করেনি। জড়তা সর্বাস্থে। খোলা ছাদে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাঁপিয়ে পড়ল সুজান। সেটা লক্ষ্য করে হাসল মোহর, ‘এটুকু সাতদিন ধরে চেষ্টা করো। একটু সড়গড় হলে তারপর দেখা যাবে।’

চেয়ারে বসে ত্যাগোল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সুজান বলল, ‘আই উইল ট্রাই।’

‘চেষ্টা করলে রপ্ত করা এমন কিছুই নয়।’

‘তুমি কতদিনে শিবেছ?’

‘অনেক বছর। এখনও ভাল শিখিনি।’

বাড়ি ফিরে মোহরের মনে হয়েছিল প্রায় কিছুই না করে সে টাকাগুলো নেবে। সুজানের শব্দ যতদিন না মিটে যাবে ততদিন এই যাওয়া আশা। কিন্তু পরের সপ্তাহে গিয়ে সে বেশ অবাক। সুজান যে সাতদিন ধরে অনুশীলন করেছে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। তার শরীরের মুড়নকেই সেকথা বলে দিচ্ছে। ছোটখাটো ভ্রুটি মোহর দেখিয়ে দিতেই সে সেটা শুধরে নিতে পারল। সেদিন মোহর বলেছিল, ‘তুমি দেখছি খুব সিরিয়াস।’

‘আমি যেটা করব বলি সেটা সিরিয়াসলি করি।’

‘তোমার এই পরিশ্রম করতে ভাল লাগছে?’

‘সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় লাগছে না। কিন্তু আমি হেরে যেতে চাই না।’ সুজান হাসল, ‘এই জন্যে ছেলেদের সঙ্গে আমার বনে না।’

‘কি রকম?’

‘যে কোনও ছেলে প্রথমে এগিয়ে আসে পরাজিতের ভঙ্গিতে, কিন্তু যেই সে পায়ের নীচে জমি পায়ময়নি বিজয়ীর মত ভঙ্গি করে। আমার ছায়া সেটা মানা সম্ভব নয়।’ সুজান মাথা নাড়ল, ‘তোমার কোনও নিষ্কষ ছেলে বন্ধু নেই?’

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলল মোহর।

‘কেন? তুমি তো বেশ আটাকটিভ।’

‘হয়তো জুডো জ্ঞান বলে কেউ এগিয়ে আসে না।’

‘হতে পারে। মার খেতে কেউ পছন্দ করে না। আমি তো টায়ার্ড হয়ে গেলাম। রোজ অন্তত তিনটে আফ্রোড, ফোনের পর ফোন। কিন্তু যেই ওরা খবর পাবে আমি জুডো শিখছি তখনই পালাবে। আমি তাই চাই।’

‘কেন?’ মোহরের মজা লাগছিল।

‘বেলাল না, আমি টায়ার্ড। ছেলেরা প্রেম করে দুটো লক্ষ্য নিয়ে। হয় বিয়ের আগে শরীর দেখবে নয় বিয়ের পর। বিয়ের পর সেই প্রয়োজনটার ধার একটু কমে গেলে তোমাকে একটা আসবাব বানিয়ে ফেলবে। মাকে তো দেখছি। সারান্না বন্ধুদের সঙ্গে রামি খেলে আর বিয়ার খায়। বাবার সঙ্গে কথাই হয় না। কিন্তু তবু পাবলিকলি ওরা স্বামী স্ত্রী, দুজনে নাকি প্রেম করে বিয়ে করেছিল।’ মুখ বেকল মোহর।

এসব কথা তো মোহরেরও। কিন্তু সে এর সঙ্গে আর একটু অন্যরকম ভাবে। কোনও একটা বালো উপন্যাসে সে নায়িকাকে কীভাবে দেখেছিল এই বলে, ‘তুমি প্রত্যাক, তুমি লম্পট, তুমি

আমাকে ভোগ করে সর্বশ্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।’ পড়ার সময় মেয়েটির জন্যে খুব সহানুভূতি জেগেছিল। উপন্যাসটি বাঙালি পাঠিকারা খুব পছন্দ করেছিল তা সংস্করণ দেখলে বোঝা যায়। পরে, অনেক পরে, ঘটনাটা মনে পড়লে হাসি পেয়েছে মোহরের। দুটো মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে যা কিছু একসঙ্গে করে তখন তার দায়িত্ব এবং ফল দুজনের ভাগে সমান থাকে। তাহলে শুধু পুরুষটি কেন নারীকে ভোগ করবে? নারীও তো সেসময় পুরুষটিকে ভোগ করেছে। সেকথা নায়িকা কখনও বলেনি। আর ভোগটোটা নির্বিবাদে করার অনেক পরে নায়িকার মনে হল নায়ক তার সর্বশ্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে। কি রকম বোকা বোকা ব্যাপার। তার যা ছিল সবই তো থাকবে তবু নিজেকে নিজের ভাবতে ভাল লাগে বলেই বলা। ওতে সহানুভূতি পাওয়া যায়। মেয়েরা চিরকাল ওইরকম সহানুভূতি পাওয়ার পথে ইটাই সুবিধেজনক মনে করে এসেছে।

সুজানের সঙ্গে মোহরের বয়সের সামান্য পার্থক্য কিন্তু বন্ধুত্ব তৈরি হতে অসুবিধে হল না। সুজানের চেয়ার, টাকাপায়সা অথবা স্টাইলের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই কিন্তু মুখের ওপর সাদাকে সাদা বলতে ও একটু দ্বিধা করে না। অনিন্দা বা সৌমিত্রা এ নিয়ে তাকে আওয়াজ দিয়েছে, ‘ঠিক আছে, দেখব কতদিন তোরদে বন্ধুত্ব থাকে?’

‘তোরা এত দ্বিধা করিস কেন বল তো?’

‘দূর! দ্বিধা কেন হবে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করি না।’

‘এটা তোর মধ্যবিত্ত কমপ্লেক্স। কাছে যেখানে পারিস না বলে নিন্দে করিস।’

কথাগুলো সৌমিত্রের সঙ্গে হচ্ছিল। অনিন্দা শুনছিল চুপচাপ। এবার বলল, ‘যার যা ইচ্ছে তাই করুক সৌমিত্র। মোহর যদি জুডো শিখিয়ে চারশো টাকা পায় তাহলে আমাদের মাঝে মধ্যে কফি জুটবে, এটুকুই লাভ।’

কথা হচ্ছিল কফিহাউসে বসে। সুজানের কফিহাউস মোটেই পছন্দ নয়। এখানে এলেই নাকি তার মাথা ধরে। ওই ডিংকার সহ্য হয় না। টেবিলে টেবিলে যে সব কষ্টস্বর জড়ায় হয় তা সমুদ্রগর্জনের মত শোনাতে ও তার মাথায় আঘাত করে। সুজান বলে, ‘বাঁজারের মধ্যে কি করে অতক্ষণ তোমরা বসে থাকো?’

কিন্তু মোহরের মোটেই বাজার বলে মনে হয় না। তার কেবলই মনে হয় এই কফিহাউস থেকেই অনেক বিখ্যাত লেখকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ এখনও গল্পের পর আসেন। এখানকার ঐতিহ্যই আলাদা। একদিন সৌমিত্র একজনকে নিয়ে এল। লম্বা সন্দেশ, মুখে হলকা দাড়ি, সুন্দর চোখ। যাকে নিয়ে এল তার ওই টেবিলে আসার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। সৌমিত্র বলল, ‘এক কাপ কফি খেয়েই চলে যেতো তোরদে সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। এরা আমার বন্ধু আর ইনি কবি দীপ্ত সেন।’ সৌমিত্র একটি চেয়ার এগিয়ে দিল।

বসতে বসতে দীপ্ত বলল, ‘আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করি কিন্তু কবি নই।’

অনিন্দার মুখ চোখ পাশ্বে গিয়েছিল। বলল ‘কিন্তু আপনার কবিতা তো আমাদের ভাল লাগে। নিয়মিত পড়ি।’

‘নারী পত্রিকা ছাপে বলে আপনারা পাঠক। আরও পাঁচটা লেখা পড়ার সঙ্গে কবিতায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া। কেউ কি পকেটের পয়সা খরচ করে কবিতার বই কেনেন?’

ওরা তিনজনের কেউ উত্তর দিতে পারেনি। দিলে কারও ভাল লাগত না। দীপ্ত সেন বলল, ‘আজকেই একজন প্রকাশকের কাছে গিয়েছিলাম। কবি কবিতার বই ছাপেন। বলেন, যে বই বিক্রি হবে না সে বই ছেপে লোকসান কেন করব? জীবনানন্দ দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অথবা নূরুল গাফিলির কবিতার বই হলে ছাপতে পারি। লোকে এদের কবি বলে, বইও কেনে। ভুললোকে উপদেশ দিলেন, অন্য কবিতার বই যেভাবে বের হয় তাই করুন। তিন চার ফর্মার বই হলে, নিজের পয়সায় ছেপে দেবুন কি রকম বিক্রি হয়। রেসপন্স গেলে আমার কাছে চলে আসবেন।’

মোহর ভিজ্জাসা করেছিল, ‘আপনার কবিতার বই বিক্রি হয় না?’



‘না। কারণ আজ পর্যন্ত কোনও বই প্রকাশিত হয়নি।’ দীপ্ত সেন হাসল।  
অনিদ্রা অবাক গলায় বলল, ‘আশ্চর্য! আপনার কবিতা তো সমস্ত শারদীয়া সংখ্যায় বের হয়। বাঙালি পাঠক এখন পয়সা দিয়ে কবিতার বই কেনে না?’

দীপ্ত সেন মাথা নাড়ল, ‘হয়তো আমরা ভাল লিখতে পারছি না বলে কেনে না। অবশ্য কাগজগুলো তো ছাপছে, এটাই বা কম কথা।’

মোহরের মনে হল তার যদি টাকা থাকত তাহলে ভদ্রলোকের একটি কবিতার বই ছেপে দেবত সত্যি কি অবস্থা! কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশঙ্গ পাশটে গেল। এখন দীপ্তই কথা বলছে আর তিনজন শুনছে। দীপ্ত বলছিল, ‘জীবনযাপনের ধরন এখন বদলে গেছে। আগে একজন পদ্যকার এবং পদ্যকার সমান মর্যাদা পেতেন। কারণ তখন মানুষ মূল্যবোধে বিশ্বাস করত। আমাদের বিশ্বাস ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত যেসব কবির নাম এবং তাঁদের কবিতার লাইন আমরা উচ্চারণ করি তারা যদি এসময় জন্মাতেন তাহলে মোটেই বিখ্যাত হতেন না। টি এস ইলিয়ট—এর মত কবি এই মুহুর্তে লন্ডনে বসে কবিতা লিখবেন কিনা আমরা জানি না। এখন গদ্যের যুগ। এবং সেই গদ্যে যদি প্রতিবাদী ভাষা অথবা থ্রিলারের দাপট থাকে তাহলে তার লেখক এই গরিব দেশেও যারকি চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। দেখছেন না, আমাদের কবিরা কিরকম গদ্য রচনার সন্ধানে সন্ধানে। এটা সত্যি কিন্তু মনে দিতে কষ্ট হয়।’

সৌমিত্র বলল, ‘কিন্তু সেইসব কবিরের গদ্য পাঠক লুফে নেয়নি।’  
দীপ্ত মাথা নাড়ল, ‘একমাত্র সুনীলদা পেরেছেন।’

মোহর বলল, ‘আপনি চেষ্টা করবেন।’  
‘ভেতর থেকে গদ্য লেখার আগ্রহ আসিনি। এলে কবর। আমি যা জাবি তা বলার মিডিয়াম হিসেবে কবিতার ফর্মই ঠিক। অন্য ভাবনা মনে এলে যা কবিতায় ঠিক মানাবে না তা গদ্যে লেখার চেষ্টা করতে তো আপত্তি নেই।’ দীপ্ত হাসল, ‘একটা সুবিধে হল আজকালকার গল্প উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে স্বরের কাগজের ভাষার কোনও পার্থক্য নেই। মনে হয় অসুবিধে হবে না।’

‘তাহলে আর সবাই সফল হচ্ছেন না কেন?’  
‘কবিরা খুব ভাগ্যবান। বিষয় নিয়ে গদ্য লিখছেন। তাই।’  
দীপ্তকে ভাল লাগল মোহরের। প্রথম দিন ব্যক্তিগত কথা হয়নি। এমনকি বাড়ি ফিরে এসে মোহরের খেয়াল হল দীপ্ত তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। ওরা প্রেসিডেন্সিতে পড়ে এটুকুই জেনেছে। সে নিজেও জানে না। দীপ্ত কি করে, কোথায় থাকে। একটি মানুষ বড় পরিকায় কবিতা লেখে, এটাই তার সব পরিচয় নয়। অবশ্য কবির দাম সৌমিত্রের আপত্তি সত্ত্বেও দীপ্ত দিতে দেয়নি।  
সুজ্ঞানকে দীপ্তর কথা বলেছিল মোহর কিন্তু সুজ্ঞান কোনও গুরুত্ব দেয়নি। বলেছিল, ‘প্রত্যেকটা প্রফেসরেরই ভাল মন্দ দিক আছে। কিন্তু যেসব মানুষ খুব হতাশার মধ্যে বাস করে তাদের আমি সমর্থন করি না।’

‘এমন তো হতে পারে ওঁর কবিতার বই ভাল বিক্রি হবে।’  
‘এমন তো হতে পারে আমি মিস ইউনিভার্স হবে। যদি হই তাহলে তার জন্যে আমাকেই উদারী হতে হবে।’

আর কথা বাড়ায়নি মোহর। কিন্তু দীপ্তর প্রতি তার ভাল লাগা কমছিল না। দীপ্তর কবিতা কাগজে ছাপা হলেই সে পড়ে ফেলত। সব লেখাই যে ভাল লাগত তা নয়। কিন্তু মোহরের মনে হত দীপ্ত একজন একা মানুষের কথা বলতে চায় যে নিজের কোনও দুঃখে নেই। মাঝে মাঝে দীপ্ত কবিতাগুলো আসে, তখন এ নিয়ে আলোচনা হয়। নিজের কবিতা ব্যাপারে দীপ্ত কিছুই বলতে চায় না। অন্যরা বললে চুপচাপ হাসে। মোহর জেনেছে দীপ্ত এখন এম. এ পড়ছে কিন্তু পড়ায়

তেমন আগ্রহ নেই। চাকরি ছেঁটাতে পারলে বরং সে খুশি হয়। থাকে সুকিয়া স্ট্রিটে। রাস্তাটা নাকি মুক্তারাবাবু স্ট্রিট থেকে বেশি দূরে নয়।

সময়ের পর অথও অবসর, কলেজে যাওয়ার আগে বাড়িতে একরকম একাই থাকা, মোহরের নবীনীর কথা মনে পড়ত খুব। নবীনী ডাক্তারি পড়ছে এই কলকাতাতেই অথচ ওর সঙ্গে দেখা হয়নি তার। হলদপুর থেকে ওর ঠিকানা আনানো এমন কিছু নয় কিন্তু সেটা করা হয়নি। তাকে লেখালেখির কথা বলত। ইদানীং এইভাবে একা থাকতে থাকতে মোহরের মনে হত লিখবে হয়। কিন্তু কি লিখবে? যে বিষয়ই মাথায় আসে মনে হয় তার আগে কেউ না কেউ তা লিখে গেছেন। যদি বিষয় মনে বের তখন ভাবনা আসে সেটা কিভাবে লিখবে? গত তিনবার মাসে সাহিত্যের নানান ভদ্র নিয়ে কবিতাগুলো এসে আলোচনা শুনেছে সে যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে কি পল্য লিখবে না গদ্য? দীপ্তর লেখা যে সব পরিকায় ছাপা হয়েছিল তার কয়েকটা মোহরের কাছে ছিল। তারা উল্টে চোখ রেখে মোহরের মনে হচ্ছিল সে পারবে কবিতা লিখতে। কিন্তু দুদিন চেষ্টার পর দ্বিতীয় লাইনই কিছুতেই কলম থেকে বেরিয়ে এল না। এ বড় যন্ত্রণার সময়। যেতে বসতে পড়তে অশ্রুতি। মাথার ভেতর যেন কাঠেরেকরা একটানা ঠুকরে যাচ্ছে। মোহরের মনে পৃথিবীর সমস্ত কবিরের প্রতি ঈর্ষা বাড়ছিল। তারা কি স্বচ্ছন্দ লাইনের পর লাইন লেখে।

সুজ্ঞানের গাড়ি এল রবিবারে। তৈরি হয়েই ছিল মোহর। ড্রাইভার তাকে চিঠিটা দিল। সুজ্ঞান লিখেছে, ‘আমি খুব দুঃখিত তোমাকে আগে জানাতে পারিনি। কারণ আমি বেবেলিলাম রাজি হব না কিন্তু শেষপর্যন্ত হতে হচ্ছে। আজ গ্র্যান্ডে একটা শো-তে আমি পার্টিসিপেট করছি। ফ্যানাল শো। তুমি এলে আমার ভাল লাগবে।’

মোহর একটু বিরতহই লে। সে ইতিমধ্যে সুজ্ঞানের দেওয়া থাম নিয়েছে বটে কিন্তু কবনই নিচ্ছে মাইনে পাওয়া পোক বলে মনে করেনি। সুজ্ঞানও তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করেনি। বরং ওর ক্রিয়াকলাপে মাঝেমাঝে সন্দেহ হত রঞ্জনার কিশোরী বাসের অত্যাশ সুজ্ঞানেরও আছে। কিন্তু শেষমুহুর্তে এমন সাদালীল ভঙ্গিতে সুজ্ঞান নিজেকে সরিয়ে দিতে পারে যে সেই সন্দেহ আর মনে দানা বাঁধেনি। তবে ইদানীং রবিবারের বিকেলে যত তাড়াতাড়ি পারে সুজ্ঞান অনুশীলনের কাজ শেষ করে গল্প করত। ওর ওয়ার্ডারোবের পোশাকের সংখ্যা এবং বাহার দেখে চমু চড়ক ঘোঁহর গিয়েছিল মোহরের। অথচ থাকে বলে মেয়েলিপনা তা সুজ্ঞানের এরমত ছিল না।

মোহর ভাল সে বাবে না। ছাত্রী হিসেবে সুজ্ঞান আজ নিশ্চয়ই অন্যা্য করছে। ফ্যানাল-শো একদিনে ঠিক হয়নি। ও জানত তবু বলেনি। ধানদা হলে জীবনে ওর মুখ দেখতেন না। তারপর মনে হল একবার অজুত সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহুড়া গ্র্যান্ড হোটেল এবং ফ্যানাল শো-এর জগৎ তার অজানা। দেখে এলে মন হয় না। পরে সুজ্ঞানকে এ নিয়ে কথা শোনাতেই হবে।

ড্রাইভারের কাছে কাছ ছিল অতএব ভেতরের ঢুকতে অসুবিধে হল না। সুদৃশ্য হলঘর সুসজ্জিত নারীপুরুষের ভিড়ে নিজেকে খুব বাগছাড়া লাগছিল মোহরের। সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে চারপাশে তাকাল। মনে হচ্ছিল এখানকার প্রতিটি মানুষ যেন সুখের আঁচে গা ঝেঁকে নিচ্ছে। তার সার্টশ্যাট পরিষ্কার কিন্তু এদের সঙ্গে মানাচ্ছে না। শো আরজ হল। বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে এতল হয়ে মেয়েরা একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের বাতায়তরের জন্যে উঁচু প্যাসেজ সজ্জানো ছিল। সেই প্যাসেজে হেঁটে এসে অজুত ভঙ্গিতে তারা দর্শকের দিকে ঘুরে আবার ফিরে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে সুজ্ঞান নেই। দেখতে দেখতে মোহরের মনে হচ্ছিল এরা দম দেওয়া পুতুল। ভেতরে কেউ চারি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর তার জোরে এরা এগিয়ে আসছে দর্শকের সামনে, দম ফুরিয়ে যাওয়ার টান বরংই ফিরে যাচ্ছে। ক্রমশ ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে উঠল ওর কাছে। অথচ এক একজনকে দেখে দর্শকরা যেভাবে হাততালি দিচ্ছে তাতে তারা যে

খুশি এতে কোনও সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে মডেলদের পোশাকের বিবরণ মাইকে বলে দেওয়া হচ্ছে। এদের বেশির ভাগ পোশাক পরে কেউ রাত্তায় ইটিতে পারবে বলে মনে হল না মোহরের। পোশাকের ডিজাইন এবং তার আধুনিকতা নিয়ে এক প্রস্তুতবস্ত্রা দিনের আঙ্কের শো-এর ডিজাইনার। কোম্পানি চলে এল দর্শকদের হাতে হাতে। তাকে চুমুক দিতে দিতে মোহরের মনে হল সে বোধহয় খুব কম বোঝে। অন্তত পোশাক নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে তা তার জানা নেই। অতএব দেখে যাওয়াই ভাল। এরকম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে আরামদায়ক চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা খেতে খেতে অন্য ভাবনা না ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিরতির পর আবার শো শুরু হল। ডিজাইনার বোষণা করলেন এবারের পোশাক বেডরুমের। বাইরের মানুষের স্টো দেশার নয়। প্রথম শর্ত থাকবে ওই পোশাকে যেন নিজের আরাম হয়, ঘুম আসে স্বচ্ছন্দে। দ্বিতীয় শর্ত যদি কোনও প্রিয়জন সঙ্গী হিসেবে থাকে তার দৃষ্টিতে যেন আরাম আসে।

আলোর চেহারা বদলে গেল। নীলাভ পাটলা একটা আলোর দ্যুতি যেন ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। মোহরের মনে হল স্বপ্নের আবহাওয়া যেন এমনই হয়। এবার মৃদু বাজনা শুরু হয়ে গেল। পরিবেশটা দারুণ রোমান্টিক হয়ে যেতেই ভেতর থেকে মডেল বেরিয়ে এল। কাঁধ থেকে পা ঢাকা সাদা পোশাক। কোমের একটা লাল ফিতে জড়ানো। এই মেয়ে যে সুজ্ঞান তা বুঝে সচকিত হল মোহর। এত পাল্টে গেছে মেয়েটা? যেন স্বপ্নসুন্দরী এখন পুতুলের মত দুলে দুলে যাচ্ছে। ওই এগিয়ে আসা, দাঁড়ানো, চারপাশে তাকানো আবার ফিরে যাওয়ার ধরন এত সাজানো যে অস্বস্তি ছাড়া মোহরের। সারলীলতার নিরাপত্তা অভাবে হচ্ছে কেন? দ্বিতীয় মডেলটি এল বায়ুমুদার ওপর ঢালা ছোট কামিজ পরে। দর্শকরা হাততালি দিল। তৃতীয়বারে ফিরে এল সুজ্ঞান। এত দ্রুত সে কিভাবে পোশাক পাটলা স্টোও বিশ্লেষণ করলেন? দ্বিতীয় মডেলটি এল পোশাক তার স্বচ্ছতা বোধহয় ঢাকাই মসলিনকেও হার মানাবে। সুজ্ঞান সামনে ঠাঁড়িয়ে হাতের আঙুল মুখের সামনে তুলে যেন হাই চাপল। তারপর ঘূমতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে ফিরে গেল। ব্যাপারটা এমন সাবলীল হয়ে উঠেছিল যে হাততালির বড় উঠল। পোশাকের নিচে স্কিনটাইট আব্রু থাকার সঙ্গেও গুরু শরীরটাকে বুঝতে পারাও অসুবিধে হবার কথা নয়। সুজ্ঞান সত্যিকারের সুন্দর একটি শরীরের মালিকনা।

গাড়ির সামনের আসন উপটোকে ভরে গেছে। অর্থপ্রাপ্তি ছাড়াও এগুনোর মূল্য কম নয়। পাশে বসে যাঁরা বেলাতে কেলেতে সুজ্ঞান বলল, 'এগুলো ফেলে দেওয়া যায় না আবার রাখারও জায়গা নেই।'

'কি আছে প্যাকেটগুলোয়?'

'শাড়ি! কসমেটিকস! ভাবছি কোনও মহিলা সমিতির দ্বিগে দেব। মুশকিল হল এগুলো এত কষ্টলি যে গরীব মেয়েরা পরে না।' নিঃশ্বাস ফেলল সুজ্ঞান।

কথটা কানে ঢুকল মোহরের। অমনা মুখার্জি একবার একটা সস্তা শাড়ি কিনে এনেছিলেন। সেটা দেখামাত্র মা বলেছিলেন, 'একি কিনেছ? এত বাজে শাড়ি কি পরা যায়?' আবার গুরু অলমারিতে একটা দু'হাজার টাকার শাড়ি তোলা আছে। খুব ছোটবস্ত্রা এক বিয়েরাড়িতে মনে স্টো পরে যেতে দেখেছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলত, কোথাও কি মাছি যে ওই শাড়ি পরব? তাই সুজ্ঞান হাতের টিকিই বলেছে। যার পরনের শাড়ি দরকার তাকে মহামূল্যবান শাড়ি অথবা দামি কসমেটিকস দিলে সমস্যাও ফেলে দেওয়া হবে।

সুজ্ঞান বলল, 'কেমন লাগল?'

'ঠিক আছে।'

'তুমি মূখ বুঝতে চাইছ না?'

'ঠিক তা নয়। কেমন পুতুল পুতুল লাগছিল মেয়েগুলোকে।'

'পুতুল পুতুল? মাই গড! মিনিমাম পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক একজন। বাম্পের মডেলরা তো আরও বেশি। প্রত্যেকেই খুব স্মার্ট। আর তুমি পুতুল বলছ?'

'আমার কাছে তাই লাগল আর কি বলতে পারি। বড্ড আর্টিফিসিয়াল।'

'হুম। তুমি বুঝতে পারছ না। একজন মডেল হল চন্দ্র গুয়ার্ডের। তার কাজ পোশাকটাকে দেখানো, নিজেকে নয়। আমাকেও তাই মনে হয়েছে?'

'দ্বিতীয়বারে এসে যখন হাই তুললে তখন আমারকম লেগেছে। আলাদা।'

খুব হাসল সুজ্ঞান। তারপর বলল, 'প্রভোকেটিং পোশাক বলে মনে হয়নি?'

মোহর তাকাল। এখন সুজ্ঞানের পরনে চমৎকার শালোয়ার কামিজ। মাথা নাড়ল সে, 'আমি তো প্রোভোকাটাইনি, বলব কি করে?'

'তুমি কেন হবে? তুমি তো মেয়ে। ছেলেদের অনেক হয়েছে। শো-এর পর আঁতখানা কার্ড পেয়েছি। সবাই আলাপ করতে চায়। ট্রাস! অশ্লীল লেগেনি তো?'

ভেবে পাচ্ছিল না মোহর। অশ্লীল বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা তার মনে হয়নি। হ্যাঁ, সুজ্ঞানের শরীরের গড়ন বোঝা যাচ্ছিল। সেই গড়ন সুন্দর। কিন্তু ওর শরীরে চামড়ার রঙের সঙ্গে মেলানো আর একটি পোশাকের স্তর ছিল না? সে সন্দেহ ছিল না? যদি সেটা না থাকত তাহলে কি অশ্লীল লাগত? সে বলল, 'তোমার এইসব নিয়েই থাকা উচিত। তুমি অনেক বিখ্যাত হবে। অন্যকিছু আর কোনো না।'

সুজ্ঞান মুখ ঘুরিয়ে নিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকবে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর অদ্ভুত পলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আশা করি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হবে না?'

মোহর মাথা নাড়ল, 'না।' কিন্তু চারপাশ টাকা রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খারাপ লাগছিল তার। টাকা মনুষ্যের এত দরকার হয়—

রাতে বিছানায় শুয়ে ওর চোখে কেবলই সুজ্ঞানই হেঁটে আসার দৃশ্যটি ঘুরে ফিরে আসছিল। সেইসময় সুজ্ঞানের হাঁটার মাথে যে পেশাদারি ভঙ্গি ছিল তাতে আটটি পুরুষ প্রভোকাট হয়েছে। তাহলে পোশাকটা অশ্লীল না হলেও ভঙ্গিটাকে অশ্লীল বলে মনে করা যেতে পারে। একটা বড় হলঘরে অনেক দর্শকের সামনে ওই ভঙ্গি এবং পোশাক মিলে মিশে একটি রমণী-শরীরের প্রতি যাতে আকর্ষণ বাড়ায় এটাই উদ্দেশ্য ছিল ডিজাইনার এবং সুজ্ঞানের। এবং এটা করার ব্যাপারে সুজ্ঞানের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না। সে করেছে পোশাকের কাটটির প্রয়োজনে। হ্যাঁ, একদম অকস্মিকভাবে মোহরের মনে অন্য একটি ছবি ভেসে উঠল। ইন্ডের সভায় দেবতাদের লোকপুত্রের সামনে বসেচা নাচছে। সেই নাচ ইন্দ্রকে খুশি করতে। তাকে নাচতে দেখেছে উর্বশী রক্তা রক্তমাংসের মূন করতে। স্বপ্নের যৌনকর্মীদের নীরত শরীর যে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি, মর্তের রক্তমাংসের নারী সেই আকর্ষণ তৈরি করেছিল। কেন করেছিল বেহুলা? না তার স্বামীর জীবন কিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞায়। এতে তার ব্যক্তিগত কামনাভাসনা চরিতার্থ করার কোনও আগ্রহ ছিল না ব্যাপারটা অদ্ভুত রকমের হাস্যকর। লক্ষন্দরকে বিয়ের আগে কখনও দ্যাখেনি বেহুলা। বিয়ের পরই শুনল তাকে বাসর জেগে থাকতে হবে পাছাড়া দিতে। যে মানুষটিকে আজ স্বামী হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হল তাকে যাতে সাপে না কামড়ায় তা দেখা তার কর্তব্য নইল বাকী জীবনটা বিধবা হয়ে কাটাতে হবে। মানুষটার প্রতি কোনও প্রণয় নয়, নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর সত্ত্বানের প্রথম পর্ব বেহুলা হেরে গিয়েছিল ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে কালঘুম পেয়েছিল বলে বিচারও গুনতে হয়েছিল। তারপর মৃত স্বামীকে জীবিত করে তুলতে তার অভিযান শুরু হয়েছিল। সে-সময় মেয়েদের সতী হবার চল ছিল না। বিধবারাও স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে করতে পারতেন। বেহুলাও সেই সুযোগ ছিল। তবু মহিলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে জলে ভেসেছিল।

অনেক ঝড়ের পর শেষপর্যন্ত তাকে দেবসভায় পৌঁছে দেবতাদের তুষ্ট করতে নাচতে হয়েছিল। সেই ন্যাস যে শরীরসর্বশ্ব নয় তার কোনও প্রমাণ নেই। বরং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। দেবতারা কেউ সূচরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। মেয়েমানুষের শরীরের প্রতি তাদের লোভ মানুষের চেয়ে বেশি ছিল। বেহুলাকেও তাই ক্যাবারে ধরনের নাচ নাচতে হয়েছিল। কেন নেচেছিল? মানুষ তার প্রেমের জন্যে অনেক কিছু করে। কিন্তু যে স্বাধীকে সে ভাল করে চিনে ওঠেনি, যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হবার সুযোগই আসেনি তার জীবনের জন্যে ওই বাড়াবাড়ি কি শুধু বৈধব্য বাঁচানোর কারণে। নাকি অনন্তকালের মেয়েলি বোকামো!

ভাবনাট্যকে কাগজ কলমে লিখতে গিয়ে মোহের দেখল খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না বরং বেশ ভালই লাগছে। মাথার মধ্যে একগাদা ভাবনা এবং সেগুলোকে কলমের ডগা দিয়ে কাগজে ছড়িয়ে দেওয়া যেন চমৎকার একটা খেলা। কোন জায়গাটার ভাল লেখা হল কেনোটা হয়নি তা নিজের বুঝতে পারছিল সে। মন লেখাকে ভাল করার চেষ্টা চলছিল সমানে।

দ্বিতীয় দিনে লেখাটা শেষ হল। মোহরের তখন নান্দু উত্তেজনা। ইচ্ছে হচ্ছিল কফি হাউসের বন্ধুদের কাছে ছুটে গিয়ে লেখাটা পড়ে শোনাতে। আবার সেটা করতে তার এক ধরনের লজ্জাও হচ্ছিল। এটা ঠিক মেয়েলি লজ্জা নয়, বরংকোনো মুশকিল। সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে সৌমিককে মোহর খুব উদাসীন গলায় বলল, 'আমি একটা লেখা লিখেছি। গদ্যরচনা।'

'রচনা যানে? স্কুলে যা লিখতাম?'

'দূর। এটা ঠিক প্রবন্ধ নয়, রম্যরচনা ধরনের।'

'অ?'

'শুনবি?'

'কত বড়?'

'আট পাতা। ফুলস্কাপের।'

'ওরে স্বাস। দশ বারো লাইনের কবিতা শোনা যায়। তুই কবিতা শোনা, শুনবি?'

খুব রাগ হয়ে গেল মোহরের। দুদিন সে কবিতাউসে পেল না। কাজে শেষ হলে লাইব্রেরিতে, সেখান থেকে বাড়ি। লেখাটার কথা তখনভাবে মনে থাকল না ওর।

প্রথম বছরটা কলকাতায় নিরিবাসে কেটেছিল। গোলকপতি ব্যানার্জি তার ব্যবহারে যে অসন্তুষ্ট হননি সেটা বোঝা যাচ্ছিল। ছুটিছটিয় সে যখন হরদুর্ভাগে যায় তখন ভদ্রলোকের মুখভঙ্গি বলে দেখে, না গলেই ভাল হয়। কলেজ থেকে কোরার সময় ভদ্রলোককে বৈঠকখানার ঘরে বসে থাকতে দ্যাখে মোহর। তারাপর সারারাতের মধ্যে কোনও মিলায়গ নেই। ওর ছেলেদের সম্পর্কে যে সম্বন্ধানবাণী সে শুনেছিল তার সঙ্গে বাহরের কোনও মিলা হয়নি। এই এক বছরে তারা কখনওই মোহরের কাছে আসেনি। পথেবাটেও কেউ কথা বলেনি।

কলেজে উৎসব ছিল। সকালে-বেকুরার সময় বলে গিয়েছিল মোহর। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। এসে দেখল দরজা বন্ধ। কাজের লোকটার নাম ঘরে ডাকাডাকি পর সাড়া মিলল। লোকটা দরজা খুলে বিড়বিড় করল, 'এত রাত হল? বড়বাবু খুব রাগ করছেন।'

'আমি তো একে বলে গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি। কি জানি বাবা।'

মোহরের মনে হল প্রতিবাদ করা দরকার। আজ সকালে গোলকপতিবাবুকে রাত হতে পারে বলায় তিনি ইজিচেয়ারে বসে মাথা নেড়েছেন। তাহলে এখন রাগারাগি করবেন কেন?

বারাঙ্গা দিয়ে এগিয়ে সে বৈঠকখানা ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভেতরের আলো জ্বলছে কিন্তু গোলকপতি সেখানে নেই। সে ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে আর একটা দরজা দেখতে পেল। সেই ঘরে কথা বলছে কেউ। সেদিকে এগোতেই কাজের লোকটা পেছন থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করতে লাগল চলে যাওয়ার জন্যে।

লোকটার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হল মোহর। গভীর মুখে বলল, 'ওর সঙ্গে কথা বলব?'

লোকটা কিসকিন করে বলল, 'এখন না, কাল সকালে। এখন নিজের ঘরে যাও।'

'কেন? এখন কি অসুবিধে?'

'এখন বাবু মানুষ নেই। ওসব ভূমি বুঝবে না। যাও, কাল সকালে বোলো।'

প্রায় জোর করলেই তাকে বাইরে বের করছিল লোকটা। ওইসময় ভেতর থেকে গোলকপতির বাজঝাই গলা ভেসে এল, 'কোন শালা এখানে?'

'আজ্ঞে কর্তা, আমি।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিস হতভাগা?'

'আজ্ঞে, মানে, বেড়াল। বেড়াল ঢুকছিল।'

'তাড়িয়েছিস?'

'হ্যাঁ।' লোকটা জবাব দিচ্ছে আর ইশারা করছে চলে যেতে।

'অম্বদার মেয়ে কিরোছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা। অনেক আগে কিরোছেন।'

বারাঙ্গা চলে এসেছিল ওরা। অতএব নিজের ঘরে ফিরে এল মোহর? এখন বাবু মানুষ নেই যার কি? অমানুষের কাজ ওই বৃদ্ধ কিভাবে করবেন? তার মনে হচ্ছিল কাজের লোকটা নটুক করল। অশ্রা গোলকপতির গলার স্বর এখন অনরেকম লাগছিল।

খাওয়াপাওয়া করার পর আলা নিভিয়ে শুতে গিয়ে মোহরের মনে হল একবার নীচে নেমে দেখলে হয়। সেদিন অনিদ্রা বলছিল উত্তর কলকাতার কিছু মানুষ এখন তন্ত্র প্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা আত্মা চালান করা যায়। কাউকে ভয় দেখাতে পোষা আত্মাকে পাঠানো যায়। এই এলাকার মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত অনেক তান্ত্রিক নাকি ওই করে ধনধান হাচ্ছেন। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়িগুলোতে এখনও কিছু প্রাচীন মানুষ ওই বিশ্বাস নিয়ে বাস করছেন। দক্ষিণ কলকাতায় এদের দেখা যাবে না। সেখানে আবার ছিলো গুরুবাদের বাড়াবাড়ি। মোহরের মনে হল গোলকপতি কি সেরকম কিছুস সঙ্গে জড়িত? যে মানুষটা দিনের গভীর নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে থাকেন তিনি রাতে কিভাবে আনুশ্য হয়ে যাবেন? কৌতুহল বাড়ছিল। নিঃশব্দে নীচে নামল সে।

বারাঙ্গার পা রাখতেই গলা পেল, 'এখন ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, যাও।'

'বললাম একটা রিক্সা ডেকে দাও, বাড়ি চলে যাই।' গলাটা মেয়েদের।

'না। সন্ধ্যাবেলাই হলে সেটা নিতাম। মাথারোএ এ বাড়ি থেকে রিক্সায় উঠলে বাবুর মান থাকবে? শুয়ে পড়, ভোর ভোর ডেকে দেব। যাও।'

মোহর দেখল একটা স্ত্রীলোক বারান্দা দিয়ে কোণের ঘরে চলে গেল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে কাজের লোকটা বৈঠকখানা ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। এখন বাড়ি সুন্দর। কোথাও কোনও শব্দ নেই। স্ত্রীলোকটি যে ঘরে ঢুকল সেখানে সেই বৃদ্ধা রয়েছে থাকে। মোহর ভেবে পাচ্ছিল না স্ত্রীলোকটি এতজন গোলকপতির ঘরে কি করছিল? স্ত্রীলোকটির পরিচয়ই বা কি। কৌতুহল তাকে নিঃশব্দে ছোট ঘরের দরজার পাশে নিয়ে এল। এখানে কোনও আড়াল নেই। যদিও বারান্দার আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা জ্বালালেই সে ধরা পড়ে যাবে। ঘরের ভেতর স্ত্রীলোকটি গজগজ করছিল, 'আলো জ্বালা যাবে না, পেপ্তি হয়ে থাকতে হবে।'

'চুপ কর। ঘুমতে দে।' বৃদ্ধার গলা।

'ঘুমিয়ে মর। তোমার তো কিছু করার নেই ঘুম ঘাড়া। এখন কিছু রাত হয়নি, আমি ঠিক চলে যেতে পারতাম।' স্ত্রীলোকটি রগে গিয়েছিল।

‘কেন? এখানে শুনে কি পিপড়ে কামড়াবে?’

‘আমি আর আসব না। এর পরের বার অন্য লোক এনো তোমরা?’

‘ইস! আসবে না। ফোকটে টাকা পাচ্ছে মাগি, আবার কথা!’

‘ফোকটে? টিপতে টিপতে হাত ব্যাথা হয়ে যায় তবু বুড়ার ব্যাথা মরে না!’

‘মাসে চারদিন মাত্র। দুই একদশী পূর্ণিমে আর অমাবস্যা। কর্তার ব্যাথা বাড়ে বলে তো ভোকে ডাকা। তার জন্যে হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিল। আমাদের ঘোঁষনে কেউ দিত অত টাকা? সারাজীবন তো কিগিরি করে গেলাম। লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ হাত বাড়ালেও মুঠো বুলত না। তোদের দেখলে হিঁসে হয়।’ বুড়ির গলায় ঝঁঝ।

‘হিঁসে হয়, টিপে দ্যাখো না ওই ঘাটের মড়াকে। শরীর তো নয় ঝড়ের লাস। তার ওপর মদ গিলে মেজাজ টং। চাপ কামালেই থিঁস্তি করে। হ্যাঁ, মুরাদ যদি থাকত তাহলে আমারও মজা হত। তা মুরাদ চলে গেছে বিশ বছর আগে অথচ হাতের সুখ করতে ছাড়ে না। আমি কি মানুষ নই?’

‘তাহলে কাজটা ছেড়ে দিবি?’

‘দেখি!’

‘মাস গেলে হাজার ট্যাকা পাস, তোর ভাতার ছেড়ে কথা বলবে?’

‘বলে দেব। বুড়াকে ম্যাসেজ করি এটুকুই জানে, বুড়া যে হাত বেলায় তা তো জানে না।

জানলে কবুক্ষেত্র করবে। আজ রাতের ডিউটিতে গিয়েছে বলে তবু বাঁচোয়া।’

‘মাথ ঠাণ্ডা করে ঘুমিয়ে পড়। বুড়া মানুষ শিশুর মত। তাই ভেবে নে।’

‘শিশুর মত। দাঁত নেই একটাও তবু মাড়িতে কি জোর, যেন রাক্ষস!’

মোহর সরে এল। বৈঠকখানায় বন্ধ ঘরের দিকে তাকাল। গোলকপতি ব্যানার্জির গম্ভীর মুখটা মনে পড়ল। কে বলবে ওই বৃদ্ধ নির্জন বাড়িতে মাসের চাররাত এইভাবে সুখ ভোগ করেন! কোথায় যেন সে পড়েছিল পুরুষমানুষের লালসা চিত্তার আগুন ছাড়া শেষ হয় না। এই কারণেই ঔর নিজেরা এই বাড়িছাড়া হয়েছে!

নিজের ঘরে ফেরে এলো সে। একটি বছর এ বাড়িতে থেকেও সে এসবের কিছুবিস্তর জানত না। জানার পর নিজেকে আর নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। গোলকপতি কি তার ওপরেও অত্যাচার করেন? মাথা নাড়ল সে। না, সেটা করেন না। করলে বেদম মার খাবেন। তাছাড়া কলেজটির ভয় বুড়াদের বেশি থাকে। ওই শ্রীলোকটিকে সে প্রথমে বারবনিতা বলে ভেবেছিল। পরে বুঝতে পারল ওরও স্বামী সৎসার আছে। ম্যাসেজ করে। সেটা করতে গিয়ে টাকার লোভ প্রকাশ দেয়। কিন্তু এ বাড়ির কাজের লোক এবং ওই বৃদ্ধা এসব ঘটনা জানে অথচ কখনও মুখ খোলেন না। মোহরের মনে হল এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। হোস্টেলে চলে যেতেই হবে তাকে।

পরদিন সকালে কলেজে যাওয়ার সময় মোহর ভেবেছিল বৈঠকখানা ঘরের দিকে তাকাবে না। কিন্তু গোলপতির গলা কানে এল, ‘দিদিমনি!’

সে দাঁড়াল। কিন্তু মুখ ফেরাল না।

‘কাল রাত হয়েছিল কিরতে?’

‘হ্যাঁ। আমি আপনাকে বলে গিয়েছিলাম।’

‘তা গিয়েছিলে। বছরে এক আধদিন দেরি হতেই পারে। কিন্তু শহরটার নাম কলকাতা। রাতের বেলায় এখানে মেয়েছেলে একা নিরাপদ নয়।’

‘বাড়ির ভেতরেও যে নিরাপদে থাকে তাও নয়। তাছাড়া আমি মেয়েছেলে নই। আমি একটা মেয়ে কিন্তু মানুষ।’

‘অ। মেয়েমানুষ বললে ক্ষতি নেই।’

‘পুরুষমানুষ বললে মেয়েমানুষ বলা যায়। তবে হয়ে করে নয়।’

হাসলেন গোলকপতি। হাসতে হাসতে বললেন, ‘অম্মদা লিখেছিল তোমার মধ্যে তেজ আছে। তা দেখছি আছে। তোমাকে আমি খুব স্নেহ করি দিদিমনি। তাই বিপদের কথা মনে আসে। যাও।’

অত্যন্ত ভাল ব্যবহার। ইটতে ইটতে মোহর ভেবে পাচ্ছিল না এই মানুষটা রাতের বেলায় কি করে মানুষ ছিলেন না। মানুষের অনেকগুলো চেহারা আছে? এক একজনের সঙ্গে সে এক এক চেহারায়ে কলমেদশা করে। প্রাশশকে পুলিশ জেলে পাঠিয়েছে যেসব চাড়ে তার সবগুলোই হয়তো সত্যি। কিন্তু তার সঙ্গে প্রাশশ যে ব্যবহার করত তা অন্যকেউ বিশ্বাস করবে না। সেটাও তো সত্যি ছিল। তাই আমি গোলকপতি ব্যানার্জিকে যে চেহারায়ে দেখছি তার বাইরে উনি কি মানুষ তা জানার দরকার নেই।

কলেজ ট্রিটের মোড়ে খুলন্ত অবস্থা থেকে বাস থেকে যে লোকটা নেমে তার দিকে তাকিয়ে হাসল সেই লোকটিকে অনেকদিন দ্যাখিনি মোহর। দেখে ভাল লাগল।

‘আপনি বাসে খুলে যাচ্ছেন?’

‘এই সময় ওটা কি খুব অস্বাভাবিক?’

‘সামর্যণ মানুষ যা করে তা আপনাকে মানায় না।’

‘আমার অপরাধ?’

‘আপনি কবিতা লেখেন। আমি চেষ্টা করেও ওটা পারিনি।’

‘বাঙালি কবিতা লিখে পেট ভরাতে পারে না। একটা সুখের দিচ্ছি। আমি চাকরি পেয়েছি। দীপ্ত হ্যাল।’

‘সত্যি? কনগ্র্যাচুলেশন।’

‘মাইনেটাও খারাপ না। তিন হাজারের একটু বেশি। প্রাইভেট ফার্মে। সেখানেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ায় নেমে পড়লাম।’

‘এভাবে নামলে চাকরি থাকবে?’

‘নামার সময় ভাবিনি।’ দীপ্ত রাস্তার দিকে তাকাল, ‘চাকরি করা দরকার কারণ তাহলে মাস পাঁচেকের মধ্যে কবিতার বই বের করতে পারব।’

‘আর একটা বই মাস আসছিল। মোহর হাসল, ‘উটে পড়ুন।’

‘কো গেল বাসটির হাতল ধরার জায়গাও নেই। সেদিকে তাকিয়ে দীপ্ত বলল, ‘আচ্ছা, আজ যদি আমার খুব জ্বর আসত তাহলে নিশ্চয়ই অফিসে যেতাম না।’

‘তা তো ঠিকই।’

‘তাহলে ধরে নিই আমার জ্বর হয়েছে। সারাদিন আড্ডা মারা যাক।’

‘আমার যে ক্লাস আছে।’

‘ডুব দিলে তবে বোঝা যাবে ক্লাস ছিল।’

‘কোথায় যাবেন?’

‘কেন? ককিহাউস। প্রায় বিনা পয়সায় সময় কাটানোর এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় পাব। দীপ্ত ইট্টা শুরু করল।

‘অনিশ্চয়ের ডাকব?’

‘ওরা তো সময় হলে আসবেই। আমার সঙ্গ কি খুব খারাপ লাগবে?’

কি থেকে কি হয়ে গেল, কেন হল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই কিন্তু ব্যাপারটা চুপচাপ ঘটে গেল। সারাক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে থাকা, জ্বরেজ্বরে ভাব, নিজের জন্যে এক অদ্ভুত আরাম নিজেই তৈরি করা। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে

মোহর, ঘুম আসেনি। সেই না আসা ঘুমের জন্যে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। বারে বারে দীপ্তর মুখ মনে পড়ছে। মুখের বিভিন্ন ভঙ্গি, ঠোঁটের ভাঁজ, ঘুসি এবং কথা। আজ সারাদিন ধরে দীপ্ত যেনব কথা বলেছে তাই ঘুরে ফিরে সিনেমার মত সে বারবার মনে সুনতে পাচ্ছে। এবং এসবের পরিণতিতে মনে হচ্ছে দীপ্তকে তার দরকার। দীপ্ত, আই নিউ ইউ! তার মনে একবারও সম্ভবতঃ জন্মাচ্ছে না তাকে দীপ্তর দরকার কিনা। কারণ সে যখন দীপ্তকে চাইছে তখন দীপ্তরও তাকে না চেয়ে উশায় নেই।

এরকম অনুভূতি আজ অবধি কখনও হয়নি মোহরের। এই মুহূর্তে সে মেয়ে কিনা তা নিয়েও ভাবার অবকাশ নেই। সে একটি মানুষ এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে যে মানুষটিকে দরকার তার নাম দীপ্ত। দীপ্তর জন্যে সে সব কিছু করতে পারে। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আজ সারাদিন ধরে কথা বলেছে। সৌমিত্রা কফিহাউসে আসেনি আজ। হয়তো অন্য কোথাও গিয়েছিল। বিকেল হতেই মোহর মনে মনে চাইছিল যেন ওরা না আসে। অথচ দুপুরে ভেবেছিল গিয়ে কলেজ থেকে ডেকে আনবে। দিনের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটা বদলে গেল। দীপ্ত তার কথা বলেছে, মোহর নিজের। ওরা কেউ কাউকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়নি অথচ একটি তো মানুষ প্রেম বলে। মোহর ফিস ফিস করে অঙ্ককার ঘরে শুয়ে উচ্চারণ করল, 'প্রেম!' করে ভাল লাগল না। যেন ক্রিশে হয় যোগা একটা শব্দ সুনতে পেল সে। দীপ্ত যদি তাকে বলত 'আমি তোমাকে ভালবাসি' তাহলে সে নিশ্চয়ই শব্দ করে হেসে উঠত। প্রেম ভালবাসা এসব শব্দ মানুষেরই আবিষ্কার। কোনও এক অনুভূতির নামকরণ করেছিল এককালে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলো বদলে ফেরার ক্ষমতা হয়নি। ওরা সারাক্ষণ মুখে না বললেও বলতে পেরেছিল, 'আমি তোমাকে চাই।' কেউ আমাকে চাইছে, তাকে চাইতে আমার ভাল লাগছে, জীবন তো এখানেই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেলে। দীপ্ত বলেছিল চলে আসার সময়, 'আবার কখন দেখা হবে?'

কবে নয়, কখন? একবারে নিশ্চিত হয়ে রাতের মত চলে যাওয়া। মোহর জ্বাব দিয়েছিল, 'চাকরিটাকে তো বাঁচাতে হবে।'

'কালও তো অসুখ না সারতে পারে।'

'না। সারবে। অফিস করে সাড়ে পাঁচটা কফিহাউসে এসে।'

'তোমার তো অনেক আগে ছুটি হয়ে যাবে।'

'হোক। আমি লাইব্রেরিতে থাকব ততক্ষণ।'

অঙ্ককারে শব্দ করে হাসল মোহর। সেই কবে মনে হয়েছিল ভালবাসা এক অসুখের নাম। বড্ড হোঁসলো। সে কি দীপ্তকে ভালবাসছে? না, মোটেই না। তার নিজের জন্যে যে সঙ্গী দরকার তার সঙ্গে দীপ্তর মিল আছে। অতএব সে অসুখ নয়।

মোহর বিছানা থেকে উঠল। কলকাতা এখন ঘুমিয়ে পড়ছে। যেহেতু আজ একাদশী অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা নয় তাই নীচের তলায় কোনও গজগজানি হচ্ছে না। দীপ্ত এখন কি করছে? তার মত জেগে আছে? জিজ্ঞাসা করতে হবে কাল। চেয়ারে বসে অকারণে কায়জ ঘাঁটতে ঘাঁটতে নিজের লেখাটাকে দেখতে পেল। কতদিন হয়ে গেল লিখে ফেলে রেখেছে। দীপ্তকে সে শোনাতো পারে। আটপাতার লেখা বলে দীপ্ত নিশ্চয়ই বলবে না ছোট কবিতা লিখে আনো, শুনব। সৌমিত্রা খুব স্বার্থপর বন্ধু।

মোহর চোখ বোলাল নিজের লেখায়। যেন নিজের মুখ আয়নায় দেখছে। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল ঠিক যেন জ্বাচ্ছে না। প্রথমে শব্দ কেটে শব্দ লিখছিল। তাপেরে লাইন বদলে দিচ্ছে। শেষে মনে হল জায়গাটা ঠিকঠাক বলা হয়নি। এখন নিজের কাছেই খুব কাঁচা লাগছে। নতুন করে লিখতে শুরু করল সে। আট পাতা যখন শেষ হল তখন তারের হয় হয়। দু-দুটো লেখা পাশাপাশি। প্রথমটা যখন লিখেছিল তখন মনে হয়েছিল দাঁড়ান কিছু লিখে ফেলেছে। অথচ সময়ের

ব্যবধানে সেটাই কেমন জোলা লাগল আজ। নতুন করে লেখার পর তার স্বপ্তি এল। স্বাষ্ট আসতেই স্মৃতি।

বিছানায় ফিরে গেল সে আলো নিভিয়ে। জানলার ওপাশে আকাশে ফ্যাকাশে আলো। একটু বাদেই সূর্য উঠবে। অথচ ঘুম আসছে না। সমস্ত শরীর এখন ঝিমঝিম করছে তবু ঘুম নেই চোখ। আজ সারাদিন জেগে থাকতে হবে কারণ সাড়ে পাঁচটায় দীপ্ত আসবে। সে চোখ বন্ধ করল। একটু ঘুম দরকার তার। এবং তখনই মনে হল কথাটা। আজ যে লেখা লিখলাম তা যদি সময়ের ব্যবধানে জোলা হয়ে যায়, ভাল লাগা ফুরিয়ে যায় তাহলে সেটা তো সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আজ তার মনে হচ্ছে দীপ্তকে প্রয়োজন। এটা সত্যি, সত্যিকারের সত্যি। কিন্তু ছয় মাস, এক বছর বাদে মনে হতে পারে প্রয়োজন নেই। এটা সত্যি? লেখাটাকে নতুন করে সে লিখতে পারল রাত জেগে, দীপ্তকে নতুন করে বদলে নিতে পারবে? নাকি সম্পর্কটাকে বদলে ফেলবে? পৃথিবীর অজস্র নারীপুরুষ যখন তথাকথিত ভালবাসায় পড়ে তখন তাদের কাছে সেটাই শেষ সত্যি বলে মনে হয়। কিন্তু সময়ের রোদজ্বলে মনের ঝং উঠে গেলে যখন ভালবাসাটাকে তারা ঝুঁজে পায় না তখন কজন সম্পর্কটাকে বদলে ফেলতে পারে। বিচ্ছেদের মামলাগুলো যারা করতে পারে তারা এক অর্থে বেঁচে গেল। কিন্তু করতে না পারার দলটা, এত বড় যে তাদের জীবনমুত হয়ে থাকার যন্ত্রণা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। 'মোহর ঠিক করল এ ব্যাপারে সে দীপ্তর সঙ্গে আলোচনা কথা বলে নেবে।' যেদিন আর মনে হবে না তোমাকে আমার দরকার সেদিন বন্ধভাবে সরে যাব। সম্পর্কের মৃতদেহ সামনে রেখে দুজনে সারাজীবন একসঙ্গে থাকব না। এই অবধি ভাবার পর মোহর ঘুমিয়ে পড়ছিল। ঘুম ভেঙেছিল মধ্যদিন।

দরজায় শব্দ হচ্ছিল। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে সেটা খুলতে মোহর দেখতে পেল গোলকপতি দাঁড়িয়ে আছেন। গুর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার দিদিমণি, তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না তো!' কোনও মতে জ্বাব দিল মোহর।

'এত বেলা পর্যন্ত তো ভূমি ঘুমাও না। ওরা ডেকে গেছে কয়েকবার। আমার চিন্তা হচ্ছিল। ডাক্তার ডাকতে হলে বলো।'

'না, আমার কিছু হয়নি।'

'বেশ। আজ তাহলে আর বেরিয়ে না।'

'না। আমাকে কলেজে যেতেই হবে।'

'এখন কটা বাজে জানো? তোমার ক্লাস শেষ হবার মুখে।' গোলকপতি মৃদু হেসে ফিরে গেলেন। অদ্রলোকের ভাবভাবিতে একজন সুস্থকথন অভিভাবকের ছবি ফুটে উঠেছিল। দিদিমণি শব্দটা গুর মুখে খুব পবিত্র শোনায়। অথচ এই লোক মাসের চারটে রাত টাকার বিনিময়ে বিকৃতসুস্থ উপভোগ করেন বাতের যন্ত্রণা উপশমের অছিলায়।

অনেক ভাবনার পরে মোহর ঠিক করেছিল লেখাটা কাউকে শোনাবে না। দীপ্তকেও নয়। সে ডাকে পাঠিয়ে দিল ন্যায় পত্রিকার ঠিকানায়। অনিশ্চার কাছে সে শুনেছে ডাকে লেখা পাঠালে সম্পাদকরা খুলেও দ্যাখেন না। ইদানীং কফিহাউসে তরুন লেখকরা বড় কাগজদের খুব গালাগাল দেয়। অথচ সবাই কিন্তু সেগুলো নিয়মিত পড়ে। তার লেখা যদি সম্পাদক না পড়েন তাহলে খুব খারাপ লাগবে কিন্তু পড়ে যদি বাতিল করেন তাহলে দুঃখ পাবে না। তার দ্বারা যে হবে না এটা জানা হয়ে যাবে। এর মধ্যে দীপ্তর কবিতা বেরিয়েছে। কবিতার নাম মোহর। প্রেমের কবিতা। দেখা হতে মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি হল?'

'কবিতা লেখার পর মনে হল এই নাম ছাড়া অন্য কোনও কিছু হয় না।'

'কেলেজে আমাকে শুনিযে কয়েকজন আবৃত্তি করেছে।'

'ওরা আমার কথা বলছে।'

'না। আমাদের যা নিজস্ব তা বারোয়ারি করবে না।'

দীপ্ত কিছুক্ষণ চুপে থাকল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'তুমি আমার নিজস্ব কবে হবে?'

'আগে চাকরি করি। তারপর।'

'সে তো অনেক দেরি।'

'হোক। আমরা তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না।' হেসেছিল মোহর।

ইদানিং মোহর একটা জিনিস বেশ টের পাচ্ছে। তার ভেতরটা যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন মনে হত কেউ তাকে মেয়ে বললে যেন হয়ে করই কথা বলছে। মেয়ে, মেয়েহলে শব্দগুলো পুরুষজ্ঞাতটা নিজের প্রতীপত্তি তৈরি করার সুবাদেই ব্যবহার করে। প্রতিবাদ করার জন্যে উন্মুখ থাকত তখন। এখনও সেই মানসিকতা একেবারে যায়নি তবে প্রকৃতি মনুষ্য মানুষকে দূরকভাবে তৈরি করেছে সেটা যেন নিতে পারছে। এই মনে নেওয়া মনে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করা নয়। মেয়েদের স্বাধীন অস্তিত্বকে যে পুরুষ স্বীকার করবে না তার সঙ্গে কোনও সহযোগিতায় যেতে সে রাজি নয়।

মাঝে মাঝে মোহরের মনে হয় এই অবস্থার জন্যে মেয়েরাই দায়ী। দুজন তিরিশ পার হওয়া মহিলারা একত্বিত হলে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তা পুরুষরা কখনওই করে না। শাড়ি, ছেলেমেয়ে, কর্তার খেয়াল অথবা গয়নার প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলায় কি সুখ যে সেইসব নারীরা পান তা বুঝে উঠতে পারেনি মোহর। কেবলই মনে হয় চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে বঙ্গনারীরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। এবং এইসব আলোচনার পর অবশ্যই আসবে অন্যের আচরণ সম্পর্কে আপত্তি জানানো। কোনও স্বাবলম্বী মহিলাকে স্বামী-নির্ভর রমণী ইহার কারণে সহ্য করতে পারে না। আর এই স্বর্গার শরিক হিসেবে সে আলোচনার সঙ্গিনীকে পেতে চায়। এইসব নারীরা মনে করে পুরুষজ্ঞাতটা শুধু তাদের শরীরবদ্ধ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। ফলে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সব ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া বঙ্গনারীর পক্ষে এত বছরেও সম্ভব হল না।

দীপ্তর দিকে তাকালে মোহরের মন ভাল হয়ে যায়। অদ্ভুত এক জ্যোতি যেন ওর মুখে খেলা করে সবসময়। কফিহাউসে অন্য মেয়েরা দিদি দীপ্তর সঙ্গে কথা বলে তাহলে একটুও ভাল লাগে না মোহরের। এটাতো বোধহয় প্রাকৃতিক নিয়ম। আমার পিতামাতা সন্তানকে আমার মত সাহাবী ভালবাসুক, না ভালবাসলে আমার খায়াপ লাগে। কিন্তু আমি ছাড়া কেউ যেন আমার রক্তের সম্পর্কবিহীন স্রিয় পুরুষ অথবা নারীকে না ভালবাসে। বাসলে আমি সহ্য করব না।

অবশ্য দীপ্ত সাদাসপাটা বাঙালি নয় যে আলোসন্ধ ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একটি পত্রিকা ঘিরে গোষ্ঠী তৈরি করেছে ওরা। বোহেমিয়ান হবার চেষ্টায় তারা যা করে তেড়ায় তা নিয়ে আলোচনা করে ততশরৎ। কেউ কেউ বলে নিয়মভাঙার বেপারোয়ারি ওরা নিজেদেরই ভেঙে ফেলেছে। খানামিষ্টালায় মদ গিলতে যখন ওরা যায় তখন দীপ্তও সঙ্গী হয় মাঝে মাঝে। এ ব্যাপারে এখনও কোনও কথা বলেনি মোহর। একদিন দীপ্ত এক বিখ্যাত কবির কথা বলছিল। আগের রাতে মদ্যপান করার পর পার্কে বসে তিনি চপমা হারিয়ে ফেলেছিলেন। চশমার অভাবে প্রায় অন্ধ সেই কির উই হয়ে হাতডো হাতডো পার্কের ধারে চলমা ঝুঁকতে ঝুঁকতে ডিঙকার করে উঠেছিল, 'আমি অার কতকাল এভাবে ঝুঁকব?' রাতে বাড়ি ফিরে দীপ্তর মাথায় নতুন লাইন এসেছিল কিন্তু সকালবেলায় সেটা একদম ভুলে গিয়েছে। মোহর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'লিখে রাখেনি কেন?'

দীপ্ত মাথা নেড়েছিল, 'তখন কলম হরতে পারতাম না।'

'এত মদ খেয়েছিলে?' বিরক্ত হয়েছিল মোহর।

'আসলে নেশা করার জন্যে বাইনি। ষাওয়ার ঘোরে খেয়ে ফেললাম নেশা হয়ে গিয়েছে।'

'মদ খেতে ভাল লাগে?'

'মদ লাগলে ষেভাম না।'

'আমাকে ষাওগায়ে?'

দীপ্ত মোহরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'মুশকিলে ফেললে।'

'কি রকম?'

'আমরা ষাই সম্ভার মদ। প্রথম খেলে সেটা অখাদ্য মনে হবে। দ্বিতীয়ত খালসিটোলায় গিয়ে

তুমি মদ ষাছ এদৃশ্য অনেকের সহ্য হবে না। ওখানে কোনও মহিলাকে মদ খেতে দেখিনি।

এখনও পাবলিক প্লেসে যেসব মহিলা মদ্যপান করেন তাদের লোকে কুনজুর দেখে।'

'পাবলিক প্লেস বলতে?'

'যেমন জায়গায় পাবলিক অনায়াসে যেতে পারে। কিন্তু ফাইভস্টার হোটেলগুলোতে অথবা

নামী ক্লাবে যেসব মহিলা মদ্যপান করেন তাদের অভিজ্ঞতা বলতে কারও আপত্তি নেই।'

'কিন্তু আমি একদিন মদ ষাব।'

হেসে ফেলল দীপ্ত। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আজই চলে।'

'কোথায়?'

'সম্টলেকে। সৌমেনদার বাড়িতে। সৌমেনদা বাড়িতেই ষায়। বিদেশি মদ।'

'এখন ছুটা বাজে। ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?'

'নটা।'

'মোহরের হঠাৎই জেদ চেপে গেল। অফিস ছুটির পর এই সময়ে কলেজ ষ্ট্রিট থেকে বাস ধরা মুশকিল। দীপ্ত অনেক চেষ্টার পর একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ট্যাক্সিতে উঠেই মোহর বলল, 'আগে মুক্তরাবাবু ষ্ট্রিটে যাব।'

'কেন?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানকার নিয়মটা আমাকে মানতেই হয়। দেরি হবে একধা জানিয়ে যাব।' হাসল মোহর।

বিরক্ত হল দীপ্ত। ট্যাক্সির ভাড়া ব্যাডোনের ইচ্ছা তার ছিল না।

মুক্তরাবাবু ষ্ট্রিটে এসে মোহর দেখল গোলকপতি বানার্জির বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা যেতেই একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয়?'

মোহর মুখ তুলে লোকটিকে চিনতে পারল না। লম্বা চওড়া চেহারা, পাজমা পাঞ্জাবি পরা মানুষটির চোখে কেঁতুটি।

মোহর জবাব দিল, 'আমি এ বাড়িতে থাকি?'

'ও, তুমি অন্নদাদার মেয়ে? তোমার কথা আমি শুনেছি।'

'আপনি?'

'আমি? গোলকপতি বানার্জির বাড়ি ছেলে। তাঁর বন্ধু ছিল জীবদশায় যেন এবাড়িতে না ঢুকি। কিন্তু আজ উনি দেহ রাখতে আমাকে আসতে হল।' ভ্রমলোক গম্ভীর মুখে বললেন।

'মানে? উনি নেই? 'চমকে উঠল মোহর।'

'না। বারোটা নাগাদ সম্ভানে চলে গিয়েছেন। খবর পেয়ে আমি এসেছি। আমার ছোট ভাইয়ের আসার জন্যে অপেক্ষা করছি। ও এলে সম্ভানে যাব।'

বিশ্বাস করতে পারছিল না মোহর। গোলকপতিকে আজ সকালেও সে দেখেছে বসে থাকতে। কথা হয়নি। এমন তো অনেকদিনই হয়। লোকটাকে সে সমর্থন করত না যেমন, তেমন ব্যক্তিগত

কোনও আপত্তি ছিল না। তার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করতেন গোলকপতি। সেই মানুষটি এমন হুঁ করে ঘরে গেলেন। পায়ে পায়ে বৈঠকখানা ঘরে গৌছে সে গোলকপতিকে দেখতে গেল। ইজিচেয়ারেরি শুয়ে আছেন। অর্থাৎ ওখানেই মারা যাওয়ার পর আর তাঁর দেহকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে বসে সেই বৃদ্ধা অশক্ত একদা কাজের লোক গুনগুন করে কাঁদছে। ঘরে আরও কয়েকজন মানুষ, যাদের মোহর চোনে না। মোহর গোলকপতির মুখের দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছেন। একাদশী পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতে ওঁর শরীরে ব্যথা হত। আর হবে না। সেই ব্যথার নিরসন করানোর অছিলায় উনি টাকা দিয়ে মহিলা ম্যাসেজারকে রেখেছিলেন যার শরীরে হাত বোলাতে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি খুব তৎপর ছিলেন। আর সেটা পারবেন না। যে মেয়েটি কাজটা ছেড়ে দেবার হুমকি দিয়েছিল সে যেচারা জানত না এটা তড়াতাড়ি এ বাড়িতে আসার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। হাজার টাকা আয় বন্ধ হয়ে গেল তার।

এখন কি করা যায়? বাড়িতে কেউ মারা গেলে যে শোকের পরিবেশ তৈরি হয় একমাত্র ওই বৃদ্ধার গুণগুণানি ছাড়া সেটা এখানে নেই। সবাই অপেক্ষা করছে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য এবং সে এলেই দায়মুক্ত হবে। আজ সকালেও যার দাপটে কেউ কাছে হেঁসত না এখন তাঁকে কেউ পরোয়াই করছে না।

দীপ্ত ট্যান্ডিতে বসে আছে। ওকে ব্যাপারটা বলা দরকার। গোলকপতি তার আশ্রয়দাতা। কলকাতায় বাসস্থান জোগাড় করার যে তীব্র সমস্যা তা ভদ্রলোকের জন্যে তার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়নি। এই কৃতজ্ঞতায় তার এখন মৃতদেহের কাছে থাকা উচিত। মোহর এগিয়ে যেতেই গোলকপতির বড় ছেলেকে বলতে শুনল, 'এ বাড়িতে থাকবে কে? বিক্রি করে দেবে। যেক্ষর মত আগলে ছিল বলে এতদিন পারিনি। ছোটটা যে কেন এত দেরি করছে!'

ওর কথা শেষ না হতেই একটি মানুষ ঢুকল। সবাই তাকে দেখে যেন স্বস্তি পেল। লোকটি বলল, 'তুই দেখছি আগেই এসে গেছিস। ভাল। বড়ি কোথায়?'

'বৈঠকখানায়। তোর দেরি হল?'

'একবারে গাড়ি নিয়ে চলে এলাম। ক্যাস কিছু রেখেছে?'

'আমি দেখিনি।'

'আমাকে ধুর ভাবিস না। আগে এসে তুই হাতডানসি এটা হতেই পারে না। যা হোক পরে হিসেব হবে। আগে বড়ি গাড়িতে তোল। শ্মশানের খবরটা ওখান থেকে করবি। আমি কোনও কামেশ্বাস্থা যেতে চাই না।' ছোট বলল।

'তুই মাল খেয়ে এসেছিস?'

'কোরও বারার পরসয়া খাইনি। রোজই খাই আজ যে বাপ ছবি হবে তা কি করে জানব?'

চল।' ওদের এগিয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হিন্দু সংকার সমিতির ট্রচারে শুয়ে গোলকপতি কাচের গাড়িতে শুয়ে পড়লেন। কয়েকজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুই ছেলে শ্মশানের দিকে চলে গেল। মোহরের হঠাৎ খোলা হল কাছের লোকটিকে সে দেখতে পায়নি। গোলকপতির বশবদ মানুষটা গেল কোথায়? খোলা বাড়ির সামনে থেকে পাড়ার ভিড় সরে গেল মোহরের মনে হল বাড়িটির চেহারা বলে দিচ্ছে ওর প্রতি কারও মন নেই।

ট্যান্ডির সামনে দাঁড়িয়ে অর্ধেক দীপ্ত সিগারেট বাছিল। ইতিমধ্যে সে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গেছে। মোহর তার কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ভবে দ্যাখো। মিটার উঠছে।'

'ওরা আমাকে শ্মশানে যেতেও বলল না।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'তোমর কেউ নেই। একজন বৃদ্ধা কাজের লোক।'

'তাকে বলে এসো আজ রাতে তুমি বাইরে থাকবে।'

'বাইরে কেন?'

'আশ্চর্য! একটা মানুষ মারা গেল যে বাড়িতে সেখানে তুমি সারারাত একা থাকবে? কেউ থাকে? যাও।' দীপ্ত জোর গলায় বলল।

'খানিকটা পরে ট্যান্ডিতে বসে মোহর বলল, 'লোকটা চলে গেল।'

'সবাই তাই যায়।' দীপ্ত বলল, 'তোমার আত্মীয় তো নয়।'

'দূর সম্পর্কের।'

'ওর ছেলেমেয়েরা এসেছে?'

'হ্যাঁ। তারা এখনই আন্তিন পোচ্ছে।'

'বাঃ। তোমাকে থাকতে দেবে?'

'বুঝতে পারছি না। বড় ভাই তো চিনতে পারল।' মোহর মাথা নাড়ল, 'বলে তো এলাম, রাতে কোথায় থাকবে?'

'চলো, দ্যাখা যাক।'

সন্টলেকে সৌমেন্দা বলে যে ভদ্রলোকটির কাছে দীপ্ত তাকে নিয়ে এল তিনি বেশ সচ্ছল মানুষ। তাঁর স্ত্রীও সুন্দরী। দীপ্তকে দেখে তিনি খুব উচ্ছসিত, 'ওমা! তুমি! কি ভাল।'

দীপ্ত বলল, 'বউদি, আমায় সঙ্গে যে আছে তাকে দেখুন।'

'দেখছি। এসো ভাই। কি নাম তোমার?'

'মোহর মুখার্জি।'

'বাঃ। বোসো।'

সৌমেন্দাবুকে ভাল লাগল মোহরের। খুবই মার্জিত কথাবার্তা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সহজে কথা বলতে পারেন। মোহর দেখল দীপ্ত তার বউদিকে সাহায্য করতে ভেতরে চলে গেল। এর মধ্যে সে জানিয়ে দিয়েছে গোলকপতির মৃত্যুর কারণে মোহরের মনের অবস্থার কথা। সৌমেন্দা বললেন, 'যে কোনও মৃত্যুসংবাদই দুঃসংবাদ। মানুষটা খারাপ হলেও মৃত্যুর খবর শুনলে বিষাদ আসবেই। তুমি সজ্ঞ হবার চেষ্টা করো মোহর।'

একটু বাদেই টেমিলে স্থল বরফ এবং খাবার চলে এল। সেইসঙ্গে সুন্দর দেখতে একটি মদের বোতল। দীপ্ত বলল, 'সৌমেন্দা, মোহর কোনওদিন ড্রিন্ক করেনি। আজই প্রথমে করবে। সুতরাং আমাদের উচিত হাততালি দেওয়া।'

বউদি বললেন, 'না ভাই। ওদের কথা শুনো না। মদ না খেলে মেমসাহেব হওয়া যায় না বলে এককম বিশ্বাস করোয়া না। আমি খাই তোমার দালাল পাল্লায় পড়ে। উনি ক্লাবে কম যান, হোটলে যাবেন না, বাড়িতে বসে একাও যাবেন না তাই সঙ্গ দিতে দিতে এই দশা।'

মোহরের খারাপ লাগল। নিচ্ছের জন্যে সফাই গাওয়ার কি দরকার ছিল ওঁর। গ্রাসে ঢালা পানীয়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, না খেলেই ভাল হয়। গোলকপতির মৃত্যুসংবাদ শোনার পর শরীটা কি রকম অশান্তিতে রয়েছে। প্রিয়জন না হলেও আশ্রয়দাতার মৃত্যুর দিনে এই হাতেবড়ির কি দরকার!

'নাও।' দীপ্ত বলল।

বাড়িয়ে ধরা সোনালি রঙের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মোহর, 'না।'

'কেন? নার্ভাস হয়ে গেলে? বউদি, দ্যাখো তোমার কথায় কেমন ঘাবড়ে গিয়েছে।'



দীপ্ত শব্দ করে উঠেই রাগ হয়ে গেল মোহরের। সে গ্লাসটা নিল। আজ পর্যন্ত কারও খোঁচা মুখ বুঝে সহ্য করেনি যদি নিজের কোনও গলদ না থাকে। গোলকপতির হঠাৎ এমনভাবে মরে যাওয়ার পর তার কিছুই ভাল লাগছিল না অথচ দীপ্ত সেটা বুঝতে না পেরে ব্যস্ত করছে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'সরকারের মত একবারে খেয়ে নেব?'

সৌমেন্দ্র হাত তুললেন, 'কক্ষনো না। একটু ঢুকুক দাঁও, কেমন লাগছে দ্যাখো, ভাল না লাগলে খেয়ো না। দীপ্ত যাই বলুক কান দেবে না।'

মোহর মদ্যপান করল। জিত জ্বালিয়ে তরল আশুন গলা পুড়িয়ে পেটে যায় বলে যেসব বর্ণনা সে এককাল পড়েছিল তার সঙ্গে কোনও মিলই হচ্ছে পেল না। খুব মোলারেম একটা তিক্তটে স্বাদ, সঙ্গে বিশ্বেটের গন্ধ, একটু গরম অনুভূতি ছড়াল মুখে, এইমাত্র। সেটা বলতেই দীপ্ত জ্বোর হেসে উঠল, 'প্রিমিয়াম খেলে, ভায় বিদেশি। দিলি হলে গিলতে পারতে না।'

'গোলা কেন?'

'এই প্রাপুর উত্তর মদ তৈরির কারখানাগুলো দিলেও দিতে পারে কিন্তু পৃথিবীর কোনও মদ্যপায়ী যা বলবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যা হোক, তোমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। দীক্ষা দিয়ে দিলাম আমরা। এখন যদি খেতে না চাও তো গ্লাসটা এদিকে বাড়িয়ে দাও।'

'সেকি? এটো খাবে?'

'মদের আর এক নমুনা সুরা। এটো হয় না।'

বউদি বাধা দিলেন, 'আন্দর। ওকে গ্লাস দিয়েই সরিয়ে নিচ্ছ। আগে দ্যাখো ও আর খায় কি না। তুমি কোথায় থাকো ভাই।'

'হলদপুরে।'

'হলদপুর। সেটা কোথায়?'

গম্প জম্মে গেল। আর গম্প করার নেশায় প্রথম গ্লাসটা খেয়ে ফেলল মোহর। প্রথম প্রথম খারাপ লাগছিল কিন্তু পরের দিকে সে ভাবটা চলে গেল। দীপ্ত তাকে দ্বিতীয় গ্লাস দিল। রাত হচ্ছিল। সৌমেন্দ্রা বউদিকে খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। এদের বাড়িতে তিনখানা পোশোয়ার ঘর। ঠিক হল বউদি আর মোহর আজ রাতে একসঙ্গে শোবে। সৌমেন্দ্রা তাঁর ঘরে, অন্যটিতে দীপ্ত। রাত বেড়ে যাওয়ায় তার আর ফেরার দরকার নেই।

টেনিলে বসে থেকে গিয়ে মোহর বুঝল খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই হচ্ছে না। জিত বেশ ভারী এবং স্বাদহীন হয়ে গেছে। সে নড়াচড়া করে বউদিকে বলল, 'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

সৌমেন্দ্রা বললেন, 'জোর কোরো না।'

শোওয়ার আগে বউদি একটা ম্যাসি রং করে দিলেন, 'প্যান্ট সার্ট পরে নিক্‌নয়ি ঘুমাবে না। কিগো, তোমার নেশা হয়ে গেছে নাকি?'

মোহর হাসল, কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে চেক্স করার সময় বুঝতে পারল তার হাত-পা মাথার হকুম ঠিকঠাক মনেছে না। ম্যাসির হাতটা পেতে একটু খামেলা হল।

গুয়ে পড়ল সে আগেই। পেটের ভেতরটা গোলাচ্ছে। বমি করলে ভাল লাগত। কিন্তু সেটা করতে গলে যে আওয়াজ হবে তা দীপ্তর কানে পৌঁছাবেই। আবার বাক্সের হাসি হাসবে সে। তাই প্রাণপণে নিজেকে ঠিক করতে চাইল মোহর। সৌমেন্দ্রা খুব ভুলোক। এদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তুলনায় বউদির মধ্যে ন্যাকাপনা যেন অনেক বেশি। দীপ্তর সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আবেগে গলছেন। সে একটা রিমুন্স টের পেল।

কেউ তাকে জড়িয়ে ধরেছে। একটা বিরাট হান্ডের মুখে পা শিছলে পড়ে যাচ্ছিল মোহর ঠিক সেইসময় তাকে জড়িয়ে ধরেছে দুটো হাত। তারপর টেনে নিয়ে এল নিরাপত্তার নিশ্চিত। মোহর কৃতজ্ঞতায় তাকে জড়িয়ে ধরতে ঠোটে ভেজা ভেজা অথচ উষ্ণ স্বাদ পেল। উপকার যে করছে সে

তাকে চুম্বাচ্ছে কেন? তার ঠোটে কেবলই চাপ পড়ছে। যে হাত দুটো তাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে দুটো এখন শিথিল হয়ে স্থান পরিবর্তন করেছে। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে তিনটে শব্দ বাজল, 'মোহর, আমার মোহর।'

চোখ মেলল মোহর। ঘর অন্ধকার। এবং অন্ধকারের আড়াল সরে গেল চটজলদি। দীপ্তর গলা এবার স্পষ্ট, 'তোমার আপত্তি নেই তো?' ওর হাত এখন তার শরীর হাতড়াচ্ছে। হ্যাঁ। আপত্তি আছে। এভাবে কেন? প্রশুটা শুরু করার আগে শোনার অধিকার আমার ছিল। কিন্তু প্রতিবাদে ডেউটা মাথায় দানা বাঁচ্ছে না। একেবারে বাচ্চা ছেলের মত শরীর বিনিময় করল দীপ্ত।

প্রায়শ্চক্কার ভাবে ঘুম ভাঙল মোহরের। চকিতে উঠে বসল সে। ঘরে বউদির শোয়ার কথা ছিল, তিনি শোননি। গত রাতে আনন্দিত হয়ে দীপ্ত কখন চলে গেছে তা সে জানে না। বিছানা ছেড়ে পোশাক পরিবর্তন করল মোহর। এইসময় তার কানে আওয়াজ এল। নাক ডাকার শব্দ। সম্ভবত সৌমেন্দ্রা। সে পাশের ঘরে উকি মারতেই দীপ্তকে ঘুমতে দেখল। ঘুমিয়ে পড়ল মানুষকে কি রকম অসহায় দেখায়।

নিঃশব্দে বাইরের ঘরে চলে এল মোহর। বউদি ধারে কাছে নেই। হয়তো সৌমেন্দ্রার ঘরেই ঘুমাচ্ছেন। দরজা খুলল সতর্ক হাতে। টেনে দেবার সময় খুঁট করে শব্দ বাজল। তারপরেই সে সপ্টলেকের রাস্তায়।

শেষরাতের অন্ধকার যাব যাব করছে। কিন্তু এই সময়ও প্রাতঃসময়ে বেরিয়েছেন বেশ কিছু স্বাস্থ্যবিলাসী। হনহনিয়ে হাঁচিছিল মোহর। কিছুক্ষণ চলে আসার পর সে একটা বাস দেখতে পেল, আলাে জ্বালিয়ে আসছে। উঠে বসল মোহর। এটা কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করার কথা খেয়াল হল না। জানলায় মুখ রাখতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। কাউকে না জানিয়ে এভাবে সে বেরিয়ে এল কেন? প্রশুটা মনে আসতেই একটু হকচকিয়ে গেল সে। উত্তরটা তার নিজেরই জানা নেই। মোহর নিজেকে ঠিক বুঝতে পারছিল না। দীপ্তর ওপর তার কোনও রাগ নেই। শুধু শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে। খুব।

সেদিন বিকলে কফিহাউসে গিয়ে দীপ্তকে দেখতে পেল মোহর। একা বসে আছে। সে ওর সামনের চোয়ার নিয়ে বসতেই দীপ্ত অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত।'

'কারণ?'

'তোমার ইচ্ছে বিরুদ্ধে ব্যাপারটা করছি।'

'সেটা তো আগেই ভেবে রেখেছিলে। ওখাতিয়ে রাত কাটানোর প্লান তো সেই কারণে।'

'নিশ্চয় করে আমি মোটেই প্ল্যান করিনি। ভেবেছিলাম ইচ্ছাই করব। মাথারটে বউদি এসে আমাকে ডাকলেন। বললেন তুমি নাকি কথা বলতে চাইছ। ঘরে গিয়ে নিজেকে—।' কথা শেষ করতে পারল না দীপ্ত। মুখ নামিয়ে বলল, 'আই অ্যাম সরি মোহর।'

'ঠিক আছে। ওঠ।'

দীপ্ত অবাক হল, 'কোথায়?'

'চল, বলছি।' দীপ্তকে পেছনে নিয়ে শ্যামাচরণ দে দ্বিটে নামল মোহর। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি খুব টায়ার্ড, টায়াকি করো।'  
'যাবে কোথায়?'  
'বলছি। আগে টায়াকি করো।'  
কপাল ভাল ছিল। সেইসময় একটা খালি টায়াকি গলির ভেতর দিয়ে বের হল। তাতে উঠে বসে মোহর বলল, 'তোমার বাড়িতে কিভাবে যেতে হবে বলে দাও।'  
'আমার বাড়িতে? কেন?' চমকে উঠল দীপ্ত।  
'তোমার বাড়িতে যাব কারণ আজ তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত।'  
'ওহ, সেটা আচ্ছই কেন?'  
'নাহলে আমি স্বস্তি পাব না।'  
'কিন্তু আমার যে কিছু বলা নেই।'  
'কি বলবে? ভয় নেই, আমি তোমার বিরুদ্ধে নাশিল করতে যাচ্ছি না।'  
দীপ্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় ডাইভারকে নির্দেশ দিল। তারপর পাশে বসা মোহরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো বলেছি অন্যায় হয়ে গেছে।'  
'আমার তো মনে হচ্ছে না সেকথা।'  
'তাহলে যাচ্ছ কেন আমাদের বাড়িতে?'  
'তুমি ভয় পাচ্ছ দীপ্ত?'  
'না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে আমি চাই। শুধু মনে হচ্ছে আমার একটু সের্ব ধরা উচিত ছিল। আমিই তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতাম। আচ্ছ তুমি জোর করছ, এটা না হলে ভাল হত। মোহর, আমি আমার মা ভাই বোনকে ভালবাসি। আমি চাইব তুমি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যাও। আমাদের সমস্যা তোমার সমস্যা হোক।'  
হঠাৎই ভাল লাগল মোহরের। ভোরের পর এতক্ষণে মন ঠিকঠাক হল।  
দীপ্তর বাড়ি পুরনো ধাঁচের। অনেকদিন মেরামতি হয়নি। আসবাবপত্র সাবেকির সঙ্গে বর্তমানের বিস্তীর্ণকমের সহাবস্থান। বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে ভেতরে ঢলে পেল দীপ্ত। এটা চাননি মোহর। সে শুনতে চেয়েছিল দীপ্ত তার সামনে মায়ের কাছে কি পরিচয় দেয়। একটু বাদেই ভেতরের দরজায় একটা ছোট ভিড়কে রেখে দীপ্ত ঘরে এল। এদের একজন দীপ্তর মা। ভাড়া শরীর, পরনের পোশাকে অস্বস্ত। পাশে একটি তরুণী এবং বিবাহিতা মহিলা। দুটি বাচ্চাও রয়েছে। কেউ ঘরে ঢুকছে না অথচ চোখ বড় করে দেখছে।  
দীপ্ত পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার মা, দিদি, বোন এবং দিদির দুটো বাচ্চা।'  
'তুমি বুঝি প্যান্ট পরো।'  
প্রণাম করবে কিনা ঠিক করার আগেই শুনতে পেল মোহর প্রশ্নটা। প্রশ্নের ধরনটা খুব অস্বস্তিকর। সে মাথা নাড়ল, 'ছেলেবেলার অভ্যাস।'  
'হেলেনকেলয় তো বাচ্চারা চুসিকাঠি খায় তাই বলে বড় হয়ে সেটা খায় নাকি?'  
'না। এই পোশাকে আমার স্বস্তি হয়।'  
'ও। চুল বড় করানি কোনও দিন?'  
'না। খেলাধুলা করতাম। তাছাড়া এজাবে কাটলে চুলের জন্যে সময় নষ্ট হয় না।'  
'বে রান্না করে সে চুলও তো ধোবে। বাড়ি কোথায়?'  
'হলদপুরে।'  
দীপ্ত বলল, 'কলকাতার বাইরে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ে।'  
'ও। এখানে কোথায় থাকো?'

'এক আত্মীয়ের বাড়িতে।'  
'বাবা কি করেন? ভাইবোন নেই?'  
'স্কুলে পড়ান। আমি একাই।'  
'দীপ্ত তো সব চাকরি পেয়েছে। এখনও পাকা হয়নি।'  
এর উত্তরে কি বলবে মোহর ভেবে পেল না। দীপ্ত বলল, 'দিদি, তোরা কথা বল। মা, তুমি চা করে নিয়ে এসো।'  
মোহর আপত্তি করল, 'না, চা খাবো না।'  
দীপ্তর মা বললেন, 'ছুটকি, মিষ্টি নিয়ে আস। প্রথম দিন বাড়িতে এসেছে মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়। আমরা বাঙালি, আমাদের তো সম্প্রদায় আছে।'  
অন্তএব মিষ্টি খেতে হল। আধশব্দটা সময় পার হল যেন অনেক অনেক সময় লাগল। এই নিমন্তৃত্য অস্বস্তিকর। আবহাওয়া হালকা করতে দীপ্ত এলোমেলো কথা বলছিল কিন্তু তাতে কোনও কাজ হচ্ছিল না। ওর দিদি বা বোন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ওদের কাছে যে মোহর অন্য গ্রহের সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সে যদি শাড়ি পরে আসত, মাথার চুল কোমর ছাপিয়ে নামত তাহলে কি ওঁরা তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে খুশি হয়ে গল্প করতেন? মোহরের মনে হল, না করতেন না। ছেলের পরিচিত কোনও মেয়েকে এবাড়ির লোকজন নিজের করে ভাবতে শেখেনি। দীর্ঘকালের অভ্যাস সেটা শেখাননি।  
নমস্কার জানিয়ে চুচ্যাপ বাইরে চলে এল সে দীপ্তর সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে দীপ্ত বলল, 'প্রথম দিন ওলে ওরা একটু শেকি ছিল। তুমি কিছু মনে করো না।'  
মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছ, তুমি মদ ধাও কি করে?'  
'তার মানে?'  
'তোমার বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই জানেন তুমি মদ খাও। সহ্য করেন?'  
'আমি বাড়িতে এসে মাতলামি করি না।'  
'করো না। তোমরা যেভাবে থাকো তাতে তোমার মদ্যপান তো বিলাসিতা। টাকাটা মাকে দিলে ওঁর উপকার হয়। আমার তো তাই মনে হল।'  
'তাহলে আমার শিগারো খাওয়া উচিত নয়, কফিও নয়। কুয়োয় ব্যান্ড হয়ে থাকা উচিত।'  
'তোমাদের বাড়িটার শ্রী ফিরত তাহলে।'  
'এটা বারোয়ারি বাড়ি। অন্য শরিক আছে। কেউ একা কিছু করতে পারবে না।'  
'তোমার মা আমাকে পছন্দ করেননি।'  
'প্রথম প্রথম তাই মনে হবে। কিন্তু তোমাকে একটু সের্ব ধরতে হবে।'  
'কেন?'  
'মায়ের নেচার ওইরকম। কদিন দেখলে মেনে নেন।' মোহরের দিকে তাকাল দীপ্ত, 'মোহর, ওদের দেখে আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে চাই।'  
'আমিও।' ছোট শব্দ আলতো করে উচ্চারণ করল মোহর।  
'আমি ওদের বুঝিয়ে বলব। আমার ওপর ভরসা রাখো।'  
সেই রাতে বিছানায় শুয়ে কলকাতার একটু নিম্নবিত্ত বাড়ির মহিলাদের মুখ বারবার ভাবছিল মোহর। দীপ্তর বিধবা মা হরতো সারাঞ্জীবনে সুখের বাদ তেমনভাবে পাননি। অতৃপ্তি এবং অনুমু ক্তির সর্বাসঙ্গে। হয়তো সেই কারণে তিনি নতুন কাউকে আত্মরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁর ওর-দিদি অথবা বোন। ওদের ভক্তি বলে দিচ্ছিল মোহর যদি এবাড়িতে পাকাপাকি আসে তাহলে ওরা অন্যায় হয়ে পড়বে। দাদা একজন মহিলাকে নিয়ে এসেছে মানেই ওরা ঘরে নিয়েছে এই মহিলাই দাদার বউ হবে। সে বেরিয়ে আসার পর তিনজনেই সমানে মুখ চালিয়েছে। তার

চেহারা এবং কথাবার্তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। যে যত পারে খুঁত বের করেছে। দাদার রুচি নিয়ে বিকৃত কথা বলেছে। কেন এমন হয়? প্রকৃতি কেন মেয়েদের মনের দরজা-জানলাগুলো এভাবে বন্ধ করে রাখে! দীপ্ত মতই আশ্বাস দিক প্রথম দিনই সম্পর্কের যে দূরত্ব তৈরি হলে তা কখনও দূর হবে বলে মনে হল না মোহরের।

লেখা পাঠানোর পর ছয় মাস কেটে গেছে। সে যে একটা কিছু লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল তা নিয়ে এখন আর কোনও চিন্তা করে না। তবে কলকাতার লিটল ম্যাগ সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়ে গেছে দীপ্তর সঙ্গে বন্ধার কারণে। তাদের আয়োজিত সাহিত্যসভায় নিয়ে মিত যাতায়াত এখন। মোহর লক্ষ্য করল এইসব কবি গল্পকার যারা নিজেদের তরুণ তুর্কি বলে মনে করে তারা জনপ্রিয় এবং পাঠকবান লেখকদের লেখক বলে স্বীকার করে না। তাদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতেও যেন ওদের রুচিতে বাধে। এবং সেই প্রসঙ্গে এক্ষণিকশ্রমেন্টের বিরোধিতা করতে ওদের উৎসাহ বেশি। নিজেদের পত্রিকা বেশি বিক্রি হয় না, প্রায় জোর করেই গছতে হয় কিন্তু সেই পত্রিকা যে যার মত জেহাদ ঘোষণা করতে কোনও বিধা নেই। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে পরিকল্পিত উপায়ে লিটল ম্যাগাজিনের কোনও কোনও লেখককে দারুণ দারুণ বিশেষণে সাজিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা। মুশকিল হল ওঁরা চার নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে কারণ পাঠকের মূল ধারায় ওই পত্রিকাগুলো পৌঁছানো।

দীপ্ত কিন্তু একটু অন্য ভূমিকায়। সে যেমন লিটল ম্যাগাজিনে তেমনি বড় পত্রিকায়। একারণে তার কিছু শত্রু থাকলেও দীপ্ত নিজের আচরণ পাশ্চাত্যে। মোহরের মাঝে মাঝে মনে হয় এদের অনেকই অক্ষম, অপটু। লেখার চেয়ে কথা বলার শিল্পে দক্ষ। এমন একজন লেখককে নিয়ে এরা মাতামাতি করে যিনি বছরে একটি লেখা লিখে থাকেন কিনা সন্দেহ। দু-একজনের লেখার কমতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু বেশির ভাগ নিজেদের অক্ষমতা জানে বলেই গোষ্ঠী তৈরি করে দলবদ্ধ করে। দীপ্ত যে কেন এদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তা মোহর জানে না। প্রশ্ন করলে হাসে দীপ্ত।

ইমানি সৃজনের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্সি থেকে পাশ করে সৃজন যাদবপুরে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু মিস কালকাতা হতে পারেনি। দুজন রানার্নের একজন হয়ে কাগজের ছবিতে হেসেছিল সৃজন। সেই হাসিতে প্রচুর হাসনা দেখছিল মোহর। সৃজনের জগৎ কখনওই সাধারণ মেয়ের সঙ্গে মিলত না। এখন তো নয়ই। মডেল হিসেবে সে কলকাতার প্রথম সারির।

গোলকপতির মৃত্যুর পর বাড়ির আবহাওয়ার তেমন বদল হয়নি। কাজের লোকটি এখন হাল ধরেছে। মাঝে মাঝে বড় ছেলে আসে। দুই ভাইয়ের মধ্যে গোলকপতির বিষয় নিয়ে মামলা শুরু হয়েছে। তাই দুজনেই চাইছে যতদিন না আদালত একটা রফা করে দিচ্ছে ততদিন গোলকপতি যেভাবে ভালাতেন সেভাবেই বাড়িটা চলুক। মোহরের এ বাড়িতে থাকা মনে গোলকপতির ইচ্ছা বলে মনে নিয়েছে দুই পুত্র। অতএব বাসস্থানের সমস্যা এখন মাথা চাড়া দেয়নি। এটা স্বস্তিজনক।

সেবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয় সেটা লক্ষ্য করেনি মোহর। সেদিন বিকেলে কফিহাউসে ঢোকামাত্র অনিন্দা বলল, 'তুই গেলি!'

'মানে?'

'এতদিন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকনামটাকে তুই একা দখল করেছিলি, আজ তোর নামের ডুপ্লিকেট দেখলাম। সে আবার লেখক। ছেলে না মেয়ে জানি না।'

মোহর বিস্ময়ে পাধর। আগামী সপ্তাহের পত্রিকায় মোহর মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ ছাপা হবে। বিজ্ঞাপনে নামটা দেখেছে অনেকের। সেই মোহর মুখোপাধ্যায় যে প্রেসিডেন্সির মোহর তা মেলাতে পারেনি কেউ। দীপ্ত এলা। বিজ্ঞাপন সে-ও দেখেছে। হেসে বলল, 'আমার মনে হল লেখাটা তোমার হলে মন্দ হত না!'

মোহর হাসল, 'তাই?'

দীপ্ত তাকাল, 'তোমার ভক্তিতা সন্দেহজনক!'

'ঠিকই।' লেখাটা আমিহ পাঠিয়েছিলাম ডাকে। ছাপা হবে আশা করিনি।

একজন তরুণ কবি বলেছিল টেবিলে, 'সত্যি ডাকে পাঠিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। অভিন্যাস ডাকে।'

'তোমার কোনও চেনা লোক ছিল না?'

'না। বললাম তো ছাপা হবে আশা করিনি।'

হুইহুই শুরু হয়ে গেল। নামী পত্রিকায় লেখা ছাপা হচ্ছে অতএব সেনিট্রেট করো। কফিতে

চলবে না, মাল ঝাণ্ডাতে হবে। দীপ্তর উল্ল্যোগে কফিতে ব্যাশারটা মিটল। কিন্তু মোহর সর্বিশ্ময়ে লক্ষ্য করল কেউ তাকে নিবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল না। যারা এখন প্রশান্ত মুখে কফির কাপে চুমুক খেতে তাদের অনেকেরই ওই পত্রিকাকে গলাগাল দিয়ে মুখ পায়।

ফোরার পথে দীপ্ত বলল, 'স্ববর্তা ভূমি আমার কাছে চেপে গিয়েছিলে!'

'এটা যে কখনও স্ববরের মত মনে হবে তাই মনে হয়নি।'

'প্রবঞ্চে কি লিখে?'

'সত্যি বলব না। পড়তে দেখতে হবে। ওটা ঠিক প্রবন্ধ নয়।' প্রশ্নটা শুনে সুশি হাল মোহর।

শুক্রবার বিকেল কলেজ ট্রিটে পত্রিকা পেয়ে গেল মোহর। প্রচণ্ড উত্তেজনা তখন। কাঁপা আঙুলে সূচিপত্রের পাতায় নিজের নাম খুঁজে পেল না। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রথম পড়ল সে। তারপর নির্দিষ্ট পাতায় পৌঁছে কবু জুড়ে একটা নিটোল আকাশ পেয়ে গেল যেন। এই বয়স পর্যন্ত যেসব সুবের শব্দ সে পেয়েছে সেসব এখন ম্লান হয়ে গেছে। দ্বারার শরীরের শিরায় শিরায় যে বিক্ষমারণ ঘটেছিল সেটা যেন নেহাউই জোলা, এইসময়। 'দিদি, দামটা', শুনে পত্রিকার বিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে মনে হল কেউ গোটা পৃথিবীটা দিয়ে দেওয়া যায়।

নাম নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে মুশ্কেল পড়ল মোহর। একটুও অপেক্ষা না করে এখনই পড়তে ফেলতে ইচ্ছে করছে ছাপার অক্ষরগুলো। কিন্তু রাষ্ট্রায় দাঁড়িয়ে পড়া যায় না, কফিহাউসে গিয়ে পড়লে কেউ না কেউ হাসবে। সে সোজা কলেজে ফিরে এল। লাইব্রেরিতে ঢুকে একটা নির্জন টেবিল বেছে নিয়ে পত্রিকাটা খুলল। নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়লে কেমন অচেনা মনে হয়। অন্য কারও লেখা পড়ার স্বাদ আসে। মোহর আবিষ্কার করল তার লেখার একটা লাইও সম্পাদকশাই হল সেনেনি। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আরও অনেক কথা বলার ছিল যা না বলায় লেখাটা ইনকমপ্লিট থেকে গেছে। বেহুলায় চরিত্রটা মনে করতে করতে ওর মনে হল মেঘটার কোনও অধিকার মনে না পছন্দসই পুরুষের কাছে পৌঁছবার। থাকলে নিশ্চয়ই অন্য স্বাক্ষর নিয়ে জলে ভাসত না। সে তুলনায় যেনকার রজা উর্বাশীর পছন্দের ব্যাপারে তার কোন স্বাধীনতা ছিল। আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে অথবা জঙ্গলে বেড়াবার সময় কোন মূর্খকে ব্যবহার করবে তারাই ঠিক করে নিত। অবশ্য দেবতার যখন বিশেষ কোনও অভিযানে পাঠাতেন তখন সৌর্য উপায় ছিল না। বাঙালি মেয়েদের কোনও পছন্দই তৈরি হয়নি। সেব্যাপারে তারা সবসময় নির্ভর করে অন্যের ওপর। দুর্দশা সেই কারণে। বারবনিতাও পছন্দের ব্যাপারে ঘরের বউয়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কথাটা মনে আসতেই সে নেড়েচড়ে বসল। এ নিয়ে তো চমৎকার একটা লেখা তৈরি করা যায়। একটা সাত মনে আট বছরের বালিকাকে তার পরিবার এবং

পারিপার্শ্বিক যে সব ধর্মকর্ম পালন করতে বাধ্য করতে তাই তার জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করেছে এককাল। আট দশ বছর বয়সে শিবলিপ নামক পাথরটির ওপর জল ঢালতে শেখানো হয়েছে। কিন্তু সেই চিন্তা থেকে তার মনে যদি যৌনকান্ডাকা জাগ্রত হয় তাহলে তাকে অসতী বলবে সমাজ। পুঙ্খানুপুঙ্খ সময় ঘটা করে কুমারী পূজা করা হয়। কুমার পূজা? সেটা আস্তে বারবানিতা পাড়ায় চল ছিল বলে পড়েছে মোহর। কাগজ বের করে নোট করতে করতে সময় গড়াছিল। হঠাৎ খোয়াল হতে সে উঠে পড়ল। দীপ্তরা নিশ্চয়ই কফিহাউসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণে দীপ্ত অবশ্যই পড়ে ফেলেছে পত্রিকার লেখাটা। মুখোমুখি হলেই জানতে পারবে ভালমন্দ ব্যাপারগুলো।

কফিহাউসে ঢুকে অবাক হল মোহর। ওরা কেউ নেই। বালি টেবিলে গিয়ে বসতেই রামু এগিয়ে এল, 'আজ আপনি লেট দিদিমনি।'

'ওরা এসেছিল?'

'হ্যাঁ। দীপ্তবাবুরা দুতিনজন খালাসিটোলায় চলে গেল। আজ চল্লিশ সাল ধরে দেখছি যেসব বাবু লেখা করে তারা মদ খায়। প্রথম দিকে ব্যাপার থাকে পেরে ভাল হয়ে যায়।' রামু এখন বন্ধ। বেশি কথা বলে। বেয়ারার ভূমিকায় ওকে এখন কেউ ভাবে না।

কিন্তু মোহরের ব্যাপার লাগল। অনেক বিব্যাৎ লেখককে অনেক বছর ধরে রামু দেখেছে। তারা মদ খেত কি না তাতে কিছু যায় আসে না মোহরের। কিন্তু আজকের দিনেও দীপ্ত একটু অপেক্ষা করতে পারল না? না হয় তার এখানে আসতে দেরি হয়েছে। মোহর আবিষ্কার করল তার প্রচণ্ড অভিমানে হচ্ছে। এরকমটা তার কখনও হয়নি। অভিমানে শুধু মেয়েদেরই হয় না, মানুষামাদেরই হতে পারে। কফিহাউসের সিঁড়িতে পা দিয়ে মোহর ঠিক করল দীপ্তকে ঝুঁজে বের করবেই। ওরা যখন খালাসিটোলায় গিয়েছে তখন সে সেখানেই যাবে। দীপ্ত যতই তাকে বোঝান করই জ্ঞাংগায় মেয়েরা যায় না তবু সে যাবে। এর আগে গুন্ডের মুখে সে খালাসিটোর অবস্থানের ওই গুনগুন। অত্যাধম ট্রামে উঠে বসল মোহর। অত্যাধম মল্লিক স্পেক্যারে ট্রাম থেকে নেমে এগায়েতে লাগল সে। এদিকে রাস্তায় এখনও বেশ ভিড়। হঠাৎ দুটো অবাঙালি ছেলে তার দিকে মস্তব্য হুঁড়ে দিল। কলকাতায় থাকতে থাকতে সে বুকেছে এসব ব্যাপার উপেক্ষা করতে হয়। যতটা সম্ভব এড়িয়ে বীহার একটা কায়দা এই শহরের মানুষ রপ্ত করে নিয়েছে। মোহর ধীরে ধীরে সেটাও শিখেছে। মোহর দেখল ছেলেদুটো তার পাশে চলে এসেছে। একজন বলল, 'বহুত আচ্ছা মাল হ্যায়। পুঙ্খকে দেখো চার্জ কিডনা হ্যায়।'

মোহর দাঁড়িয়ে গেল। সে দেখল ছেলেদুটোও সামনে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ফোটাল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন?'

প্রথমজন প্রশ্ন করল, 'কত দিতে হবে?'

'কি জন্যে?'

'হুন্টি হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে হাত এবৎ পা ঢালাল মোহর। আঘাত পাওয়া মাত্র ছিটকে গেল ছেলোট। দ্বিতীয়টি এত কিছু বুঝে ওঠার আগে পেটে হাত চেপে বসে পড়ল। দুজনকে পাশাপাশি টেনে এনে আরও কয়েকটা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল। একটি মেয়ে দুটো জেলেকে অমন ধোলাই দিচ্ছে তাতে মজা পাচ্ছিল সবাই। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন তার নাম ধরে ডেকে উঠতেই চমকে ফিরে তাকাল মোহর। পাগুর তার শরীর কাঁপছিল। মোহর দেখল ছেলোট দীপ্তদের বন্ধ। কয়েকদিন ওর সঙ্গে কফিহাউসে এসেছে।

'এই দ্যাখো না, অশ্লীল প্রস্তাব দিচ্ছিল—।'

'চলে এসো, চলে এসো আমার সাথে—।' প্রায় টেনেই তাকে বের করে নিয়ে এল ছেলোট। পার্কের কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একাই মারলে দুজনকে?'

'ওরা তোমার জন্যে কম মার খেল।'

'বাপস। তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?'

'খালাসিটোলায়।'

'সেকি? তুমি ওখানে গিয়ে কি করবে?'

'দীপ্ত ওখানে গেছে। ওকে আমার দরকার।'

ছেলেটি কিছু ভেবে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি গিয়ে ডেকে আনিছি।'

ও চলে গেলে মনে মনে গ্যানদাকে ধন্যবাদ দিল মোহর। এই বিনোদ্য প্রতিটি মেয়ের শেখা উচিত নইলে এইসব নরপশুরা ঠাণ্ডা হবে না। মোহর লক্ষ্য রাখল। দূরদৃষ্টি বেশি নয় কিন্তু যারা অন্যায় করে মার খায় তারা আবার প্রতিশোধের জন্যে উঠে আসার শক্তি পায় না।

ছেলেটি ফিরে এসে হুসল, 'ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'কোথায় গিয়েছে? বাড়িতে?'

'না। বাড়িতে নয়। ছেড়ে দাও। কাল দেখা করো।'

'মোহর তাকাল, 'তুমি কি ওখানে শুনেছো কোথায় গিয়েছে দীপ্ত?'

'দীপ্ত একা নয় আর আমি যে ঠিক শুনেছি তাই বা কি করে বলি?'

'কি শুনেছ?'

'একজন পরিচিত লোক ওখানে মদ খাচ্ছিল। সে বলল, আচ্ছা মোহর, ওরা যেখানে গিয়েছে সেখানে তুমি একা যেতে পারবে না।'

'কোথায় গিয়েছে তোমাকে বলতে হবে।'

'মুশকিল হল। লোকটা তো মিথ্যে কথাও বলতে পারে।'

'সেটাই শুনি।'

'ওরা সোনোগাছিতে হুইচি করতে গিয়েছে। হঠাৎ বোধহয় শব্দ হয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র মোহর হুইতে লাগল। ছেলোট তাকে পেছন থেকে ডাকলেও সে দাঁড়াল না। এক রোয়ে হেঁটে এল সে বউবাজার ট্রিট পর্যন্ত। এসময় তার মাথা কাজ করছিল না, কানে কোনও শব্দ শোনাচ্ছিল না। দীপ্ত সোনোগাছিতে গিয়েছে? বউবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তার হুইছে হল সোজা সোনোগাছিতে গিয়ে সে দীপ্তর সামনে হাজির হতে। ওকে গ্রহণ করে কোন সুখ বা ফুটির জন্যে তুমি এখানে এসেছ? ওর মুখের ওপর এক দলা খুঁত ফেলে চলে আসবে সারা জীবনের জন্যে। কিন্তু সোনোগাছি একটা দোকান নয় যে সেখানে গেলেই দীপ্তর দেখা পাওয়া যাবে। ট্রাম ধরে সোজা মুক্তারামবাড়ি হুই চলে এল সে। দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে চূপচাপ শুয়ে রইল সে। সম্পর্কটা মারা গেল। মনে মনে ভালল মোহর। প্রাণেশ যা করত তা মুখে বলতে একটুও দ্বিধা করত না। প্রাণেশকে জীবনসঙ্গী করা যায় না কিন্তু কিছুক্ষণের সঙ্গী হিসেবে আকর্ষণও বোধ করতে হয়। সেদিক থেকে দীপ্ত একদম চোরের মত আচরণ করেছে। হয়তো কথা তুললে বলবে স্ট্রেফ অভিজ্ঞতা সঙ্কয়ের জন্যে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা কবিতার কারণে প্রয়োজন। কিন্তু দুর্বল পুরুষরাই শুধু অজুহাত তৈরি করে।

রাত্রে ঘুম আসছিল না। খিদেও লাগছিল। কোনওমতে রাতটা কাটিয়ে দিল মোহর। তারপর ভোর হতেই মনে হল দীপ্তর সামনে যাওয়া উচিত তার। যত অন্যায় করুক দীপ্ত ওকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। দীপ্তর হাসি, কথা, কবিতার লাইন, গায়ের গন্ধ—মিলেমিশে প্রবলভাবে তাকে আকর্ষণ করছিল। ওর দেখা পাওয়ার জন্যে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর কয়েক যুগ ধৈর্য ধরার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

কলকাতার হতশ্রী এলাকাগুলোও রোদ ওঠার আগেই সময়টায় কিরকম নরম নরম থাকে। মনমেজাজ ভাল থাকলে চমৎকার উদারতা চারপাশে তাকিয়ে থাকে। দীপ্তর বাড়ির সামনে পৌছে মোহরের সেইরকম মনে হল।

রাস্তায় দুচারজন অলস মানুষ। গলিতেও ভিড় নেই। দীপ্তদের বাড়ির দরজা আধোজ্বালা। অর্থাৎ ও বাড়ির মানুষের দিন শুরু হয়ে গেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন মোহর ইতস্তত করছে তখন একটা প্রায় মাঝাভাড়া বুড়ি বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে জল ছিটোতে লাগল। কাজটা শেষ করে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?

মানুষটি হাড়সর্বশ। পরনের ধান পাড়ালি স্পর্শ করেনি। জামা না পরায় বুক প্রায় উন্মুক্ত কারণ আঁচল একদিক দিয়ে শুটিয়ে কাঁধে পৌছেছে। বয়স কত তা বুড়িই জানে কিন্তু চিন্তে হয়ে যাওয়া বুক আর লজ্জা পাওয়ার অবকাশ রাখেনি। একটা শিশু অথবা পুরুষের সঙ্গে এবুড়ির কোনও পার্থক্য ও ব্যাপারে নেই।

মোহর বলল, 'দীপ্তর কাছে এসছি। ওকে ডেকে দেবেন।'

'সে তো এখন ঘুমাচ্ছে। অট্টার আগে উঠবে না।'

'আমার খুব জরুরি দরকার।'

'দাঁড়াও তার মাকে গিয়ে বলি।' বুড়ি চলে গেল।

তাহলে দীপ্ত আটটা পর্যন্ত ঘুমায়। এককালে বাগানবাড়ি ফেরত যেসব মানুষ দুপুর পর্যন্ত ঘুমাত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে নাকি। রাতে মদ খেয়ে মূর্তি করে এসে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে। ঠোট কামড়াল মোহর। তার খুব রাগ হচ্ছিল।

এইসময় দরজায় একটা মুখ উঁকি মারল। তাকে দেখেই মুখভঙ্গি পাশ্চটে গেল। দীপ্তর ছোট বোন। কি করবে বুঝতে না পেরে মেয়েটি বলল, 'আপনি?'

'হ্যাঁ। অসময়ে এসছি। তোমার দাদার সঙ্গে খুব দরকার আছে।'

'দাদা তো ঘুমাচ্ছে।'

'শুনলাম। ডেকে দেবে একটু।'

'ও। ঠিক আছে। ভেতরে এসে বসুন।' মেয়েটা দরজা ভাল করে খুলে দিল। ঘরে পা দিয়ে মোহরের মনে হল বাসি শব্দটি চারপাশে ছড়ানো। এখানেও রাতে কেউ শোয়। তার বিছানা মাটিতে গোঁড়ানো, তোলা হয়নি।

যে চেয়ারে সে আগের দিন বসেছিল সেখানে বসেইই মেয়েটা চলে গেল। একটু পরেই চাপা গলা কানে এল, 'ঘরে বসালি কেন?'

'কি করব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে পাড়ার সবাই জানবে। তুমি যাও।'

'আমি এখন গিয়ে কথা বলতে পারব না। দাদাকে ডাক গিয়ে।'

এরা অসন্তুষ্ট। এমন অসময়ে বাইরের লোককে কে-ই বা পছন্দ করে। মোহর হাসল। তার এখন মনে হচ্ছে আবেগের প্রাবল্যে এভাবে চলে আসা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু না এসে সে পারছিল না। এখন যদি ওদের আপত্তি না থাকে তাহলে সে সোজা দীপ্তর ঘরে ঢুকে যেতে পারবে। সলোপ কানে যাওয়া সত্ত্বেও সে ক্ষুব্ধ হল না।

মিনিট তিনেক অপেক্ষার পর দীপ্তকে দেখতে পেল সে। পৃথিবীর শেষ বিস্ময়কে যেন চোখের সামনে দেখছে এমন মুখের ভাব। ওর কপালে একটা স্পষ্ট কালশিটে। দরজায় দাঁড়িয়ে দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি?'

কি বলবে মোহর। যা যা বলবে ভেবে এসেছিল ওই প্রশ্নের ধরনে সেসব যেন চাপা পড়ে গেল। মোহর হাসার চেষ্টা করল।

সামনের চেয়ারে বসে দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বল তো?'

নিজেকে পাশ্চালি মোহর। যথেষ্ট স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'কাল পত্রিকা দেখেছ?'

'পত্রিকা? ও হ্যাঁ, তোমার লেখা বেরিয়েছে। পড়েছি।'

'কেমন লেগেছে?'

'ওয়েল। ঠিক আছে। তবে একটু একপেশে। মানে ওই আক্রমণটা।'

'কি রকম?'

দীপ্ত মাথা নাড়ল, 'পরে এ নিয়ে কথা বলব। এখন মাথা ঠিক কাজ করছে না। ও হ্যাঁ, কাল কফিহাউসে তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম।'

'না। সাতটার মধ্যে তোমরা চলে গিয়েছিলে।'

'তা হবে। বড়ি দেখিনি। মোহর, হঠাৎ এভাবে এলে কেন?'

'তোমার কপালে কি হয়েছে?' জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল মোহর।

'আব বোলো না। এত জোর ধাক্কা লেগে গেল। চা বাবে?'

'না।'

'তোমার বাড়িতে এ মুহূর্তে আমি অবস্থিত।'

'কে বলল তোমাকে?'

'যেই বলুক। চা খেতে হলে বাইরে যাওয়াই ভাল।'

দরজায় শব্দ হল। দীপ্তর দিকেই দেখতে পেল মোহর। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, 'এ কি কথা ভাই। ভোরবেলায় বাড়িতে এসে বাইরে চা খাবে কেন?'

মোহর সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'বিরক্ত করতে চাইনি, তাই।'

'বিরক্ত মনে করলেই বিরক্ত। এই যে দীপ্ত, আমরা সাড়ে আটটার আগে ঘুম ভাঙলে কুক্কেত্র করত, কই, আজ তো কিছু করছে না। সাপ তো বেজিকেই ভয় পায়।' দিদি হাসলেন।

দীপ্ত একটু বিরক্তগলায় বলল, 'কি যা তা বলছি?'

'কানে এল তাই কথাটা বলতে এঘরে এলাম। যদি বলিস চলে যাব।'

'আমি কি তোকে চলে যেতে বলেছি। আশ্চর্য!'

'তুই তো আজকাল সবকিছুতেই আশ্চর্য হচ্ছিস। এই যে সাতসকালে মোহর এ বাড়িতে এল তার কাছে আমরা তো বলছি না আশ্চর্য। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি মুখের ওপর সত্যি কথা বলে ফেলি, আমাদের পরিবারের কোনও মেয়ে এই কাকভোরে অন্যের বাড়িতে যায় না।'

মোহর বলল, 'এ সময় আমার আসা ঠিক হয়নি। কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই তোমার খুব দরকার হয়েছে। আড্ডা মারতে তো আসোনি।'

'হ্যাঁ। দরকারেই এসেছি।'

'তাহলে তোমরা সেটা পরে নাও। আমি চা নিয়ে আসছি।' দিদি ফিরে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে দীপ্ত মাথা নাড়ল, 'আই অ্যাম সারি।'

'জিজ্ঞাস্যে?'

'তোমাকে অপমানিত হতে হচ্ছে বলে।'

'উনি তো মিথ্যা বলেননি। অপমানিত যদি হয় সেটা গতকাল হয়েছি।'

'বুঝলাম না।'

'তোমার দিদি বললেন এ বাড়ির কোনও মেয়ে কাকভোরে অন্যের বাড়িতে যায় না। অবশ্য এখন কাকভোর নয়। কিন্তু এ বাড়ির ছেলে, ধারা, তোমার বাবা, ঠুর্কদা কি অনেক রাতে মধ্যপান করে বাড়ি ফিরতেন? পরিবারে সেই রেওয়াজ আছে?'

'ও। আমি মদ খাই মাঝে মধ্যে সেটা তোমার জন্য।'

‘জানি। কফিহাউস থেকে বেরিয়ে কবি লেখকরা খালাসিটোলায় যায় একটা রোমান্সিসিঞ্জমের  
তাড়ানায় এমন ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু গতকাল কি আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারতে না  
তুমি?’

‘তুমি এলে না, ভারলাম আর আসবে না, সবাই এমন করে ধরল—।’

‘কতক্ষণ ছিলে খালাসিটোলায়?’

‘অবাক হল দীপ্ত, ‘কেন?’

মোহরের মনে হল আর একটু যাচাই করতে চাইলে তাকে মিথ্যা কথা শুনতে হতে পারে।  
দীপ্ত মিথ্যা বলছে এটা মনে নিতে পারবে না সে কখনওই। যেন নিজের বিপদ কাটিয়ে উঠতেই  
মোহর বলল, ‘তুমি সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে।’

‘মাই গড! তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি?’

‘তোমার সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করছিল।’

‘উঃ! তোমাকে বলেছি ওখানে কোনও মহিলার যাওয়া উচিত নয়।’

‘যাওয়া উচিত নয় বলেছি তাই যাইনি। আমি ভেতরে যাইনি কিন্তু তোমার পরিচিত একজন  
ভেতরে গিয়ে আমাকে খবরটা এনে দিয়েছে।’

‘সে বলেছে আমি ভেতরে নেই।’

‘এবং সত্যি তুমি ছিলে না।’

‘হ্যাঁ। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।’

‘তোমার সঙ্গে আরও লোক ছিল।’

‘হ্যাঁ। আমরা তিনজন।’

‘বেরিয়ে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?’

‘তুমি কিন্তু এবার আমাকে ঢেঁক করছ।’

‘আমি তোমার মুখে সত্যি কথা শুনতে চাইছি।’

‘বেশ। ওরা বলল সোনাগাছিতে যাবে। একটু গান শুনবে, ফুটি করবে। আমার মনে হল  
দর্শক হিসেবে ওদের সঙ্গে গেলে কোনও অন্যায্য করব না। তাই গিয়েছিলাম।’

‘তোমার কাছে আমি কৈফিয়ত চাইনি।’

‘না। তুমি যেভাবে প্রশ্ন করছ—।’

‘আমি খুব সরলভাবে জানতে চাইছি। তুমি দর্শক হিসেবে গিয়েছিলে না অন্য কিছু সেটা  
তোমার ব্যাপার। আমি খুশি হয়েছি কারণ তুমি যে সোনাগাছিতে গিয়েছিলে এই সত্যিটা আমাকে  
বলেছ, তাই।’

দীপ্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মোহরের দিকে। স্পষ্টতই তাকে অবাক লাগছিল। এরকম খবর  
সোনার পর মোহর শাশুভাবে বসে আছে। যে কোনও মানুষ এই নিয়ে চরম অশান্তি করত।  
এইসময় দিদি চা নিয়ে এলেন।

দীপ্ত চা নেওয়ারমত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কপালে কি হয়েছে রে?’

‘ধাক্কা লেগেছিল।’

‘যা ভাল বুঝিস তাই কর। ওই ছাইপাশ না খেলে কি হয়।’

‘আবার আরম্ভ করলি?’

‘চায়ে চমুক দিল মোহর। বলল, ‘মারপিট করেছিলে?’

‘মারপিট ঠিক নয়—।’ দীপ্ত মাথা নাড়ল।

দিদি বললেন, ‘শোন ভাই। মনে হচ্ছে তোমরা খুব বন্ধু। দীপ্ত আগে কখনও এমন ছিল না।  
লেখালেখি শুরু করার পর ছাইপাশ খেতে লাগল। বাড়িতে এনিয়ে খুব অশান্তি। এক ছেলে বলে  
মা কিছু বলতেও পারে না। তুমি একটু বোঝাবে ওকে?’

‘ওর যদি মনে হয় অন্যায্য করছে না তাহলে ওকে কেউ বোঝাতে পারবে না। কাল যেখানে  
গিয়ে মারপিট করেছে সেখানে নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবারের কেউ যায়নি দিদি। ও গিয়েছিল।  
আমি বোঝালেও ওর যাওয়ার ইচ্ছে হলে যাবে।’

দিদি মাথা নাড়লেন। তারপর আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

চুপচাপ চা খেল ওরা দীপ্ত মুখ ফিরিয়েছিল অন্যদিকে। মোহর ওকে লক্ষ্য করছিল। ওর মুখ,  
মুখের রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্রমশ এক মায়ায় আচ্ছন্ন হল। তার মনে হল দীপ্ত যাই করুক  
সামনে এসে সত্যি কথা বললে সে ক্ষমা করে দেবে চিরকাল।

‘চা শেষ হলে উঠে দাঁড়াল মোহর, ‘আমি যাচ্ছি।’

‘চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।’

‘দিদিকে বলো—।’

‘ঠিক আছে।’ দীপ্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

গলিতে দুজনে পাশাপাশি ইঁটছিল। এবং তখনই প্রাপ্তপের মুখ মনে পড়ল মোহরের।  
রানীগঞ্জের কোন বাজারি মেয়ের কাছে গিয়ে প্রাপ্তপের অসুখ হয়েছিল। সেই একই অসুখ দীপ্তরও  
হতে পারে। মোহর দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘কি হল?’ দীপ্ত অবাক।

‘তুমি আজই ডাক্তারের কাছে যাবে।’

‘কেন? এই কালসিটির জন্যে? হ্যাঁ। এমন ঠিক হয়ে যাবে।’

‘কালসিটির জন্যে নয়। তুমি যেখানে গিয়েছিলে সেখান থেকে অসুখ কুড়িয়ে আনা খুব  
স্বাভাবিক ঘটনা। পরীক্ষা করিয়ে নাও।’ জোর গলায় বলল মোহর।

‘কি যা-তা বকছ! আমি এমন কিছুই করিনি যে অসুখ হবে।’

বস্তির নিশ্চাস ফেলল মোহর। দীপ্ত ইটতে শুরু করে বলল, ‘আমি তোমাকে বিশ্বাস করি  
দীপ্ত। আই নিড ইউ।’

‘আমিও। মাঝেমাঝে উন্টোপাণ্টা হয়তো করে ফেলি। ভেজা বাঙালির রুটিন লাইফ মেনে  
চল। আমার ধাতো নেই। তাই তোমার খারাপ লাগতে পারে।’

‘মোটই না। তুমি হয়তো অসাধারণ নও কিন্তু সাধারণের সঙ্গে তোমার মেলো না। আমি তাই  
চাই। কিন্তু কখনও আমাকে মিথ্যা কথা বলো না।’

‘আমি আজ অবধি নিশ্চয়ই বলিনি।’

‘এভাবে এলাম বলে তুমি রাগ করছে?’

‘ঠিক রাগ নয়। কিন্তু আমি চাই না আমার বাড়ির লোকজন তোমাকে অসম্মান করুক।’

‘তাহলে তোমার বাড়িতে কখনওই আসা হবে না?’

‘তা কেন? এলে মাথা উচু করে আতাবে।’

‘সেটা কিভাবে হবে আমি জানি না।’

ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। মোহরের লেখা পত্রিকায় ছাপা হবার পর পরিচিত  
মানুষদের মুখে কোনও আলোচনা শোনেনি সে। হলদুপুরে চিঠি লিখে বাবাকে জানিয়েছিল মোহর  
লেখার কথা। অন্নদা মুখার্জি চটপট জবাব দিয়েছেন অনেক প্রশংসা করে। অত বড় পত্রিকায়  
নিজের মেয়ের লেখা ছাপা হলে যে কোনও বাবাই খুশি হবেন বলে ওই চিঠির তেমন গুরুত্ব

দিত চায়নি মোহর। কয়েকদিন পর পত্রিকা মারফত নন্দিনীর চিঠি পেল সে। নন্দিনী ডাক্তারি পড়েছে। সে লিখেছে, ‘শেষ পর্যন্ত তুমি লেগালেগি শুরু করলে। আমি তোমাকে বলতাম লেখা তোমার হাত পারে। তাই আমার নিজস্ব ভাল লাগা তোমাকে জানালাম। তোমার বিষয় আমি পছন্দ করছি না। আজকাল মেয়েদের হয়ে ওকালতি সবাই করে। মেয়েরা একশ্রেণীর অসহায় পুত্রবধূ আর ‘গুরুত্বের নারীখাদক এখন ছবি আঁকার পেছনে যে মাসিকতা তাকে বোধহয় সমর্থন করার দীন শেষ হয়ে গেছে। এটা করে এখনও কিছু সন্তার হাততালি পাওয়া যায় কিন্তু ইস্টাটা ক্রমশ ক্রিশ হয়ে এসেছে সেটা তোমার বোঝা উচিত। নারীপুরুষ দুটি সমান শ্রেণীর প্রাণী। নারী বলে দম্য কর দম্য কর বলার কি আর দরকার? তোমার বেহুলা চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। আচ্ছা ধরো, তুমি যা যা লিখেছ তাই করে বেহুলা স্বামীর জীবন বাচাল। তারপর লক্ষীর গুরু সন্দেহের চোখেও দেখল। স্ত্রী দেবসভায় ক্যাবারে নেচেছে জানার পর পৃথিবীর সব পুরুষেরই বুক ভুলগির হয়ে যায়। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়ে থাকে? বেহুলা যদি লক্ষীরকে এই বলে শাসনে রাখে যে তোমার জীবন আমি বাঁচিয়েছি অতএব আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে তাহলে তো তোমার বিশ্লেষণ মিথ্যা হয়ে থাকে। সেই সুযোগে দেবলোকের কোনও কোনও লম্পট দেবতা বেহুলার সঙ্গে টুটকাক প্রেম কর যেতে পারে ওর ইচ্ছায়। অতএব দাম্যদ, সব শেষই শেষ নয়। তবে তোমার বলার ধরন ভাল। বুঝ রসালো। ভাল আছি। পারলে চিঠি দিয়ো। একই শব্দে থাকি, হচ্ছে হলে আসতেও পারো। নন্দিনী।’

এ চিঠি মোহরের মোটেই খুশি করতে পারেনি। নন্দিনী যতই বলুক এখনও এই বাংলায় নারী-পুরুষ এক শ্রেণীতে জায়গা পাচ্ছে না। এখনও মেয়ে হয়েছে জানলে বাড়ির মেয়েদের মুখ কালো হয়। এখনও বাড়ির অল্পবয়সি মেয়েকে নানান পাহারায় রাখা হয়। এখনও মেয়েরা পুরুষের কল্যাণ কামনায় সারাদিন উপোস করে থাকে। কোনও পুরুষকে মেয়েদের জন্যে ওই কর্মটি করতে শোনা যায়নি। হঠাৎ আমরা এক মানের হয়ে গেছি বলে চিৎকার করলে সেটা অত্যন্ত অবাস্তব হবে। নস্যৎ করার জন্যে কথা বলায় শেষ পর্যন্ত সূর্য নেই।

দুই সপ্তাহ পরে পত্রিকায় কিছু চিঠি ছাপা হল। প্রথম চিঠি একজন সর্বশিক্ষেয়া প্রবীণা লেখিকার। তিনি দুহাতে আশীর্বাদ করেছেন এমন রচনার জন্যে। সেইসঙ্গে সাধনায় কয়েকনে প্রতিদান করতে গিয়ে অযথা আঘাত দেবার প্রবণতা থেকে ঘেন মোহর নিজেকে সামলে নেয়। তিনি নিজে সারাজীবন মেয়েদের হয়ে লিখেছেন, তাঁদের সমস্যা র কথা বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু এই নিষ্পত্তি লিখতে পারলে তিনি খুশি হইতেন বলে জানিয়েছেন।

সম্ভবত এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা বদলে গেল। সম্পাদকের চিঠি পেল মোহর অবিরামে আর একটি রচনা পাঠাতে হবে।

দ্বিতীয় রচনাটি শুরু করল মোহর এইভাবে, ‘আমাকে পত্রিকার সম্পাদক লিখতে বলেছেন। তিনি একজন পুরুষমানুষ। আমার পিতাও একজন পুরুষ। যে মানুষটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, যার সঙ্গে জীবনযাপন করার পরিকল্পনা আছে সে-ও পুরুষ বলে জানি। অতএব পুরুষদের বিরুদ্ধে আমার কোনও জেহাদ থাকতে পারে না কারণ তাদের অধিকাংশই অজ্ঞান বলে মনে করি।’

এবারের রচনার বিষয় ধর্ম এবং নারী। যেহেতু পুরুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছিল নিজের ইচ্ছানুযায়ী এবং সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে এবং সেই কারণে নারীকে বশবলদ রাখতে পেরেছে দীর্ঘকাল। এখনও একজন মহাগুরু ঘোষণা করতে পারেন বৈদিক মন্ত্রে নারীর কোনও অধিকার নেই। এই হাস্যকর তথ্য এ দেশের নারীরাই মেনে নিয়েছেন অস্বীকার করে। পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয় ধর্ম নামক এক ভয়ঙ্কর ড্রাগ মেয়েদের রক্তে মিশিয়ে দিয়ে তাদের চিত্তাধিপত্যে অর্কধর্ম করার রাখা হয়েছে যা কাটিয়ে উঠতে এখনও সক্ষম হয়নি। কলকাতায় এগুলো বারোয়ারি পূজা হয়

তার একটিতেও কোনও মহিলাকে পৌরোহিত্য করতে দেখা যায় না। যদি কেউ করেন, মহিলা পরিচালিত সেই পূজা খবরের কাগজে বড় জায়গা পাবে। বিধাবাদের কিছু অংশ সবে আর্মিস খাওয়া অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু বাকি অংশ এখনও তিরিয়ে। মেয়েরা এগিয়ে এসেছে অন্ধকারকে অবলম্বন করে। কাঁধে বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড গরমে যেসব পুরুষরা এককাল তারকেশ্বর শিবের মাথায় জল ঢালতে যেত, তাদের মিছিলে এখন কিছু অংশেই মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। হেই উদ্ভানদা কি কারণে জ্ঞানতে চাইলে নির্বোধ উত্তর পাওয়া যাবে। ওই যাত্রাপথে সেইসব মেয়ে কি স্বাধীনতার আনন্দ পাচ্ছে? বেদশে এইসব অন্ধ আচরণ এখনও সমগ্রাধ্য হয় সেই দেশের উন্নয়ন কতটা সম্ভব? বাঙালিদের যে অংশ নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় তারা কি ধরনের হিন্দু। ওই নামে যে ধর্মের কথা তারা বলে সেটা কে চালু করেছিল? কয়েকজন দেবদেবীর মূর্তি এবং ভূমিকা মানুষ তৈরি করে নিয়েছিল। সেটা যে ধর্ম নয় তা বিবেকানন্দ অনেক বলেও বাঙালিকে বোঝাতে পারেন নি। যারা এই কাঙ্ক্ষা করতে পারত তারা স্বার্থের কারণে নিম্নশূণ থেকেছে। নিজেকে ভোট করে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চায়নি রাজনৈতিক দলগুলি। একই কারণে অনেককাল মেয়েদের রাজনীতিতে অংশ নিতে দেয়নি তারা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন মাতঙ্গিনী হাজার কোনওরকমে ছিটকে জায়গা করে নিয়েছিলেন কিন্তু ক্ষুদ্রিয়ার থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত পুরুষদেরই নামানলি সাজানো। সূর্য সেনকে যে মহিলারা সমর্থন করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের উল্লেখ করাচিতই কেউ করে থাকে। আর এখন মহিলা ভোটারদের সমস্ত করার জন্যে দলের উচ্চপদে বা মন্ত্রিসভায় দু-একজন মহিলাকে জায়গা দেওয়া হয় টুটে ভগ্নমধ্য বানিয়ে। একই ধর্মের বৃহদশ মানুষের কাছে হুনমান পবনদেবের মর্যাদা পায় অথচ সেই একই ধর্মের অন্য ভাষাভাষী মানুষ তাকে কলা খাওয়ানোর বসিকতায় সীমাবদ্ধ রাখে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে এই অসাড় তথাকথিত হিন্দুধর্ম নামক অভ্যেসটিতে ত্যাগ না করলে বসনারীর পটশিববর্তন কখনও হবে না।

লেখাটি ছাপা হল অবিরামে। এবার বিজ্ঞাপিত হয়েছিল বিষয়। টেউ উঠল সহজেই। একদল নিম্নায় খুবই হলেন। মৌলবানীর নেচেড়েও বসলেন। দেখা গেল শিক্তি বঙ্গ সমাজের অনেক মানুষ, যারা প্রগতিশীল হিসাবে নিজাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরাও এই বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারছেন না। প্রতিপোরে বন্যা বয়ে গেল। নারীর সমাজন ছবিটিতে কালি মাখানোর এই অপদানের বিরুদ্ধে তারা কলম ধরলেন। নারী মানে জন্ননী, তাকে দেবী হিসেবে দেখেছে হিন্দুধর্ম। মা পটটির মধ্যে বিশ্বের তারো শ্রদ্ধা নিহিত। চপলমতি কোনও যুবতীর বোয়াদপিত্তে সেই চিরকালীন ছবি স্নান হতে পারে না।

মোহরের তৃতীয় লেখা ছাপা হল। নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ। এবং এই লেখাটি রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের ধর্মের বাঁধ ভাঙল। মোহর লিখেছিল নারীকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে কখনও কারও মা, কখনও মেয়ে কখনও স্ত্রী। এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো না পারলেও সে মা অথবা মেয়ে থেকেই যাবে কিন্তু স্ত্রীর ভূমিকা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। যেহেতু সে কারও ওরসে এবং গর্ভে জন্মেছে তাই নারীর ভূমিকা তাকে পালন করতেই হবে যদি সেই জন্মদাতা বিপরীত বেকের মানসিকতার হন তা সত্ত্বেও। একইভাবে গর্ভজাত সন্তানকে সে অমান্য করতে পারে, অস্বীকার নয়। কিন্তু নারীর বধূ নিজে রাজত্ব করার দীন শেষ হয়ে গেছে। বিবাহের মাঝে বা সেই মানে ডিরকালের গোপ্যাবৃত্তি বড় লেখা এখন সেটা ভাবলে ভুল হবে। এখনও, এই চ্যুরানব্বই সালে, প্রাণ্ডবক্ষ্যস্ক কন্যাসম্ভানের ফটো পাঠান পিতা নিজাপনের উত্তরে। তিনি একবার তেবেও দায়ন না তাঁর মেয়ের মধ্যে যেসব অজ্ঞানা অচেনা মানুষের হাতে পড়েছে তারা কিভাবে লুকচোয়া কিসকালে কেউ চোখ মুখ নিয়ে মস্তব মস্তব কেউ গায়ের রং কেউ বা শরীর। এই যে নাও গো আমার মেয়েকে নাও, নিলে সঙ্গে আরও



সম্পত্তি দেব বলে কন্যার পিতারা এ দরজা থেকে ওই দরজায় ছুটে যান তাতে তাদের কি সম্মানহানি হয় না? নিজের চরিত্রের সঙ্গে একজন ব্যবসিতার দালালের পার্থক্য কি দেখতে পান? এবাব করে নিজের মেয়েকে তিনি কোন পর্যায়ে নামিয়ে ফেলছেন? তারপর দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া মেয়ের অজস্র ফটোর জ্বাবে কোনও সাড়া না এলে তিনি কি ভাবেন বিনি পয়সাতেও তোকে কেউ নেবে না মা। এটা এখনই বন্ধ করা দরকার। বিবাহ অবশ্যই সাময়িক বন্ধন এবং তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তার পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং সম্মানজনক হওয়া উচিত স্পষ্টত সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকযুবতীকে বিয়ের আটচল্লিশ ঘণ্টার সময় সম্মান দরজা বন্ধ করে সঙ্গম করার অধিকার দেওয়া হবে তাদের আনন্ডিত হবার অবকাশ হয়তো থাকে কিন্তু ব্যাপারটার স্থূলভ্রম নিয়ে কেউ চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ করেন না। নারীর উচিত ওই বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে বলা যতদিন না তিনি পুরুষটির সঙ্গে সখ্য তৈরি করতে পারছেন না ততদিন তিনি পোশাক উন্মোচন করবেন না। বিবাহের পর পুরুষটিকে তার আস্থা অর্জন করতে হবে। পুরুষটি যদি না শুনতে চায় তাহলে তার আত্মীয়দের জ্ঞানিয়ে দেবার অধিকার নারীর আছে।

পুরুষমানুষ নারীকে মা বানিয়েছেন। ওই সাইনবোর্ড খুলিয়ে দিয়ে বিশ্বের অনেক তত্ত্ব শব্দটিতে ঢুকিয়ে যে বিপুল ঊত্তরাব্রাহ্মী এতকাল চালিয়ে আসা হয়েছে তার নিরনন্দন দরকার। সমীক্ষা নিলে নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া যাবে না সেই সব নারীর যারা মা হবার রাসনা নিয়ে প্রথম দিনেই স্বামীর সঙ্গে শয়ন করেন। সেই শয়ন তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দের কারণে যা বোধ উৎসবে সম্পূর্ণ হয়। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নারীর শরীরে সন্তান আসে। সে মা অথবা জননী হয়ে পৃথিবীর গ্ল্যামার বাড়াবে বলে শরীরে সন্তানের জন্ম দেয় না। এ কথা রামকৃষ্ণদেব অথবা রীন্দ্রনাথের গর্ভাধারীণী ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জন্মানোমাত্র ঐরা যদি মাতৃহারা হতেন তবু পরবর্তী কালে আমরা রামকৃষ্ণদেব অথবা রীন্দ্রনাথকেই পেতাম। সারাদেশেরী শুধু রীন্দ্রনাথকেই দেখে দেননি তাঁকে আরও অনেক সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে হয়েছিল এবং তাঁরা কেউ রীন্দ্রনাথ হননি। আমরা কেউ আমাদের জনকজননীর সঙ্গমের দৃশ্য কল্পনা করতে চাই না। কিন্তু সেই ঘটনা আর পাঁচটা রনরারীণী জীবনের মতো স্বাভাবিক। পরবর্তী কালে আমরা নারীর চারপাশে বেগমজাল চাপানোর তাগিদে তাকে মা অথবা জননী বানিয়ে আদর রাখতে চাই যেটা পিতার বেলায় প্রয়োগ করি না। তিনি তাঁর খেয়ালমুশিমতো চরে বেড়াতে পারেন, তাঁকে জগৎপিতা বানাবার কোনও প্রয়োজন এবাবকাল পুরুষরা বোধ করেনি।

রীন্দ্রনাথ কলম ধরেছিলেন। তারপর অনেক লেখা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। তাতে নারীর কর্তৃত্ব স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে তা ইতিহাস বলবে। যতক্ষণ না অর্থনৈতিক দুর্দশার আঘাত পুরুষের ওপর আছড়ে পড়ছে ততক্ষণ সে নারীকে স্বাধীনতা দিতে চায়নি। অতাবের হাঁ-মুখ বন্ধ করতে সে নারীকে শিক্ষিত করেছে চাকরি করার মতলব নিয়ে। সেই স্বাধীনতা পেয়েছে বলে বিবাহের পরে সন্তান শরীরে আসার পর নারী যত্ন জ্ঞানতে পারে তার স্বামী একজন সীট তাহলে সে স্বচ্ছন্দে আবেগসান করাতে পারে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। তবন জননী বা মায়ের সাইনবোর্ড কোনও কাজ করে না। মুশিকল অন্যত্র। প্রাকৃতিক কারণে নারী মাস তিনেক চলে যাওয়ার পর আর অবাঞ্ছিত সন্তানকে শরীরস্থির করতে পারে না। তাতে তার জীবনসংশয় হতে পারে। সেই সন্তান পৃথিবীতে আসার পরে তাকে লালন করতে বাধ্য হয় সে। কিন্তু কোন কানসিকারও তাতে তথাকথিত মাতৃভাব কটুটুকু থাকে? এই প্রশ্নের সরল জবাব শুনবার জন্যে আমাদের কানকে প্রস্তুত করতে হবে। শোখানো বুলি উগার দেবার দিন আর নেই।

স্বাভাবিকভাবেই লেখাটি মোহরকে তাবৎ ব্যঙ্গালির কাছে বিতর্কিত করে তুলল। দিন সাতকে বাদে ঘটনাটা ঘটল। সজ্জের পরে কফিহাউস থেকে বেরুবার মুখে কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর

ওপরে। দীপ্ত সঙ্গে ছিল। বাধা দিতে গিয়ে সে-ও আহত হল। শ্যামাচরণ দে ট্রিটের রাস্তায় মোহরকে চিত করে শুইয়ে আক্রমণকারীরা ওর সার্টশাট খুলে নিল। গ্যাসিট এবং ব্রা পরা শরীরটাকে ওরা ছুঁড়ে দিয়েছিল চলন্ত গাড়ির সামনে। ব্রেক কষতে পেরেছিল ড্রাইভার তাই মরণ এল না। কয়েকটা বোমা ফাটিয়ে আক্রমণকারীরা সদস্য চলে গেল জায়গাটা থেকে।

আচমকা ওই আক্রমণে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল দীপ্ত। তাঁর চোখে কেটে রক্ত পড়ছিল। তবু ছুটে গেল সে রাস্তায়। গাড়ির চাকার সামনে দলা পাকিয়ে পড়েছিল মোহর। ওর শরীর নড়ছিল না। অন্তর্ভাসের আড়ালটুকু যেন চোখেই পড়ছিল না, ওর বাবতীয় নুগুতা গিচ্ছিল দুই ফুটপাখের মানুষ। দীপ্ত ওকে আড়াল করতে চাইল নিজের পাঞ্জাবি খুলে। তাই দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে সে ড্রাইভারকে অনুরোধ করল হসপিটালে পৌঁছে দিচ্ছে। ওর শরীর তোলামাত্র মানুষকাল যেন সক্রিয় হয়ে উঠল। চিৎকার চোঁচোতে কিছু বিজ্ঞারকে পেছনে ফেলে গাড়িটা মোহরকে মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দিল।

তিনিদিন মেডিক্যাল কলেজে ছিল মোহর। এই তিনিদিন স্বরের কাগজগুলোতে ঝড় উঠল। কলকাতার ব্যস্ত রাস্তাপথে একটি যুবতী মেয়েকে প্রকাশ্যে নগ্ন এবং আহত করার স্পর্শা রাখে যে দুর্বৃত্তা তাদের গ্রেফতারের দাবিতে সবাই সোচ্চার ছিল। বিরোধী পক্ষ পুলিশ কমিশনার এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইল। যথাপরীয়া বললেন, কলকাতার সঙ্গে জঙ্গলের আর কোনও তফাত রইল না। কিন্তু ঘটনাটির দায়িত্ব নিতে কেউ এগিয়ে এল না। পুলিশ প্রথমে বলল ব্যক্তিগত আক্রোশ মেহোতে কেউ গুণ্ডাদের দিয়ে এ কাজ করিয়েছে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সংযোগ নেই।

তৃতীয় দিনে মোহরকে সাবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হল। তার মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। দানহাত ভেঙে গেছে। বুকে আঘাত লেগেছে। স্বর পাওয়ামাত্র হলদুদর থেকে অল্পদা মুখাঙ্কি ছুটে এসেছিলেন। সাবাদিকরা তাঁকে মেয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনিও ব্যক্তিগত আক্রোশ মেহোনের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এর মধ্যে একটি বড় পরিকল্পনা এগিয়ে এল মেহোর স্বর্ঘমর্ষনে। যাওয়ার ভাল চিকিৎসার জন্যে তারা ওকে নামী নারিহোমে ভর্তি করতে ভাবত করল। আওয়ার আগে মোহর সাবাদিকদের লেখা, 'আমার অন্তত এইতু ভাবতে ভাল লাগছে যে আক্রমণকারীদের মধ্যে কোনও মহিলা ছিল না। নগ্ন করার সময় ওরা আমাকে শাসিয়েছিল এর পরে কলম ধরলে আমাকে শেষ করে দেবে। যতদিন ওরা একথা বলতে পারবে ততদিন কেউ না কেউ ওদের বিরুদ্ধে লিখে যাবে। এই বিবৃতি তার পরে পুলিশ তাদের বাবন বদলালেন। মোহরের লেখা কিছু মানুষকে উত্তেজিত করেছিল বলে এই ঘটনা ঘটছে।

দীপ্তও আমতা মারাত্মক ছিল না। কিন্তু সে-ও খবরের কাগজের বিষয় হল। দুজনে জড়িয়ে কিছু সাদালা গল্প ছাপা হল। পুলিশ প্রথমে একটি তৃতীয় পক্ষকে আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল। কেননা দীপ্তকে প্রায়ই থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে বেতে হয়েছিল।

অপরহায়া ধরা পড়েন। পুলিশ যে কয়েকজনের পাকড়াও করেছিল চুরিচামারি ছিনতাইয়ে তাদের নাম থাকলেও এই ঘটনার সময় অন্যত্র থাকার খবরও প্রমাণ ওদের ছিল। সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এসে ওদের কাউকে মোহর চিনতে না পারায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

মোহরের সুস্থ হয়ে দিন দশক লেগেছিল। এই কটা দিন দীপ্ত জো বটেই, কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে দুল্লা নারিহোমে দেখা করতে যেত। ঘটনাটির প্রতিবাদে একদিন ধর্মঘট হয়ে গেল কলেজ। নারিহোমে শেখ দিনে হঠাৎ যোগাটটির প্রতিবাদে ছোঁচছেলে দেখা করতে আসে। মোহর তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেনি। ভুললোক অল্পদা মুখাঙ্কি এবং দীপ্তের সামনে লাল দাঁতে হাসলেন, 'মনে থাকার কথা নয়। বাবার মৃত্যুর দিন দেখে থাকলেও এখন কি করে মনে থাকবে। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটেই যে বিড়িতে থাকা হয় সেটা আমার বাবার।'

অমরা মুখার্জি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি মেয়েকে দেখতে এসে ওই বাড়িতেই উঠেছেন অথচ তাঁর এই আত্মীয়পুত্রের দর্শন একবারও পাননি। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি।

লোকটি হাত নাড়ল, নওব আত্মীয়তার ব্যাপার বাবা বুঝতেন। আমি তো আমার মামাতো ভাইবোনের নামই জানি না। যাকগে, জানেন নিশ্চয়ই বাড়ি বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে আমার মামলা চলেছে। আমরা দুজনই ওখানে থাকি না। ফরসলা হয়ে গেলে ওই বাড়ি বিক্রি করে দেব। তা আমাদের উকিল বলেছেন ও বাড়িতে কেউ যেন এখন বসবাস না করে।

মোহর বিছানায় শুয়ে লোকটিকে দেখছিল। তার মনে পড়ল গোলকপতির মৃতদেহ সংস্কার করতে লোকটি মদ্যপান করে এসেছিল। সে বলল, 'আপনারা তো ওখানে থাকেন না।'

'আমরা থাকি না কিন্তু অন্য কারও থাকা চলেবে না। জানি, বাবা থাকতে দিয়েছিল কিন্তু এখন অন্য অবস্থা। তাছাড়া—' লোকটি চুপ করে গেল।

অমরা মুখার্জি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে মেয়ে কোথায় থাকবে ভেবে পাচ্ছিলেন না। বললেন, 'তাছাড়া?'

'হ্যাঁ। এই যে মারপিট হয়ে গেল, কি কারণে হল জানি না, কিন্তু যারা মেয়েছে তারা মুক্তারামবাবু স্মিটে গিয়েও শাসিয়েছে যে ওখানে আপনারা মেয়েকে আর জায়গা দিলে লাশ ফেলে দেবে। বুঝতেই পারছেন, এরপর—' লোকটি খুব অসহায় ভাব করল।

দীপ্ত বিজ্ঞানসা করল, 'পুলিশ ওদের বুঁজে পাচ্ছে না অথচ ওরা আপনারদের শাসিয়ে গেল। আপনারা ধানায় ব্যাপারটা জানিয়েছেন?'

'দূর। কে ঝামেলায় যায়। তার চেয়ে অন্য কোথাও চলে যান। আমরা যেতে বিপদ ডেকে আনতে চাই না। নমস্কার।' লোকটি যেন এসেছিল তমনি বেরিয়ে গেল।

পুলিশকে জানানো হল ঘটনাটা। স্ববরের কাগজে আবার জায়গা পেল মোহর। ততদিনে স্পষ্ট হয়েছে মৌলবাদী শক্তি মোহরের মুখ বন্ধ করার জন্যে এই কাজ করেছে। পুলিশ কমিশনার বলে ফেললেন 'কোনও দাগি অপরাধী নয়, বিশেষ এক ধর্মমন্সক রাজনৈতিক দল তাঁদের গৌড়া সমর্থকদের উত্তেজিত করেছে এই কাজ করতে। যেহেতু অপরাধীদের কোনও অতীত রেকর্ড নেই তাই ধরতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু ধরা হবেই।'

লোকসভাতেও এই নিয়ত ইচ্ছা চল। কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে একটি যবতীকে নগ্ন করা হয়েছে কারণ সে মহিলাদের হয়ে কথা বলতে চেয়েছিল। সামাজিক ক্রাতি-বিদ্ভূতি এবং অসম্মতি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল লেখার মাধ্যমে। ভারতবর্ষের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ মোহর মুখোপাধ্যায়ের নাম জেনে গেল।

ফরানীল পরীক্ষা সামনে। অমরা মুখার্জি ভেবেছিলেন এখন মোহরের মানসিকতা পরীক্ষা দেবার মতো নেই। কলকাতায় থাকার জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি মেয়েকে হলদুপুরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোহর পরীক্ষা দেবেই। এবং একেবারে আকস্মিকভাবে সে সুজানের বাড়িতে জায়গা পেয়ে গেল পরীক্ষা পর্যন্ত।

সুজান এখন মডেল হিসেবে খুব নাম করেছে। বেশির ভাগ সময় বোম্বেতে থাকতে হয়। সেখানে বসে সে মোহরের খবর পেয়েছিল। কাজ শেষ করে কলকাতা এসে নার্সিংহোমে যেদিন দেখা করতে এল সেদিনই মোহরকে ছেড়ে দেবার কথা। সবে শুনে সে নিজেই প্রস্তাব দিল ওকে সল্টলেকে নিয়ে যেতে চায়। মোহরের আপত্তি ছিল না। দীপ্ত অন্য কোনও ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেন দিল যদিও নিজের অক্ষমতা কাজে খুব যত্নগা

অমরা মুখার্জি ফিরে গেলেন। সুস্থ হলেও বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল মোহর। সুজানের সাজানো বাড়ি থেকে বের হতে চাইত না সে। এবং এই সময় পরীক্ষার জন্যে তৈরি হবার ফাঁকে ফাঁকে সে তার পরের লেখাটি তৈরি করল। লেখাটির নাম মেয়েদের শরীরের গঠন এবং প্রকৃতি।

পাঠানোমাত্র ছাপা হল সেটা। আর একটা ঢেউ উঠল। মুন্সারামবাবু স্মিটে সে থাকে না তবু কয়েকটা বোমা পড়ল সেখানে। পত্রিকা পোড়ানো হল শেয়ারদা স্টেশনে, বাসবাজার স্মিটে। পুলিশ আর কিছু অপরাধীকে হাতেমতে ধরতে পারল। তাদের একজন পুলিশকে বলল, 'লক্ষ লক্ষ মানুষের কয়েক হাজার বছরের বিশ্বাসকে একটি চপলমতি যুবতী ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে এ হতে পারে না। ওইসব লেখা পড়ে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলেই প্রতিবাদ করছে।'

সমর্থনে এগিয়ে আসল কিছু নারী মানুষের কলম। রামচন্দ্র দশরথের সন্তান ছিলেন কিনা তা নিয়ে এখন আমরা ভাবতে চাই না। তিনি মহান মানব ছিলেন যিনি ক্রমশ দেবতার পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছেন। সীতাকে মাটি থেকে কুড়িয়ে পাওয়াটা বড় কথা না তাঁর জগজ্জননী রূপটা? যারা শোকা বাবেই চায় তারা সনাতন ভারতবর্ষকে বিপন্ন দেখতে ইচ্ছুক।

মোহর পরীক্ষা দিল পুলিশ পাহারায়। পরীক্ষার পরেই ওর প্রথম বইটি প্রকাশিত হল। কলেজ স্মিটের এক নামী প্রকাশক মোহরের প্রকাশিত লেখাগুলো একসঙ্গে বই করে ছাপলেন। বইয়ের নাম 'আহামসক'। কিন্তু এত দ্রুত ওই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাবে প্রকাশক ভাবেননি। এই প্রথম একটি প্রবন্ধের বই, যাতে গল্প-উপন্যাসের মজা নেই, শব্দ থেকে গ্রাম্যলক্ষ মানুষের হাড়ে হাড়ে ঘুরতে লাগল। এক মাসের মধ্যে বইটির রোজগার কপি বিক্রি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দামের বইটির সম্মান-দক্ষিণা বাবদ মোহরের ছোজরায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

দীপ্ত আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। এক দুপুরে সৌমিত্রের সাক্ষী হিসেবে সই দিল। ওরা বিয়ে করল। ব্যাপারটা দীপ্ত জানিয়ে রেখেছিল বাড়িতে। বিয়ের আগে মোহর অমরা মুখার্জির অনুমতি নিয়েছিল। অভ্রাণেরের ইচ্ছে ছিল হিন্দুমতে একমাত্র মেয়ের বিয়ে হবে দুম্বামের সঙ্গে দেবেন। কিন্তু মোহরের প্রবল আপত্তির কথা তিনি জানতেন। স্ত্রী কেঁদে ভাসালেও মেয়ের ইচ্ছেটাকেই মেনে নিলেন। দীপ্তকে চিঠি লিখলেন অবিলম্বে যেন মোহরকে সঙ্গে নিয়ে হলদুপুরে চলে আসতে।

মোহর মুখার্জি এ বাড়ির বউ হয়ে আসছে এবং সেই কারণে সনাই বাজছে না, শব্দবর্ধনি হচ্ছে না, ম্যারাগ বাঁধা হয়নি, কাজকে নেমস্তম্ভ করলেন এরা—এমন একটা গল্পে পাড়ায় চাটায় ঘরে গিয়েছিল। মেয়েরা বলেননি বীন্দ্রামির সীমা থাকা উচিত। পুঙ্খবান মত্তব্য করলেন, কলসাপ ঘরে এলে গৃহবের ঘুম হয় না। কিন্তু ট্যান্সি থেকে যখন দীপ্তর সঙ্গে মোহর নেমে এল তখন সবাই ভিজি জমিয়ে দেখতে এলেন। এমন বিখ্যাত হয়ে ওঠা একটি মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে আসছে বলে কিছুটা ঈর্ষাও চোখেপড়ে ছিল। অকিঞ্চিৎকারণে গিয়ে তাঁরা অবশ্য গর্ব করলেন আমাদের পাড়ার বউ মোহর মুখার্জি।

দীপ্তর মা বোনরা যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করলেন। যে মেয়ের প্রায় নগ্ন শরীর রাস্তার লোকজন দেখেছেন, যে মেয়ে কেবলই ইতিহাসের কথা বলে, তাকে ঘরের বউ হিসেবে কল্পনা করতে ওঁদের বাধ্যছিল। কিন্তু একমাত্র রোজগারের ছেলের ছেলের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কারও ছিল না। মোহরকে দীপ্তর জন্যে বরাদ্দ ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের দেওয়ালে শেষ রং করে কাবো করা হয়েছে কেউ জানে না। বিছানার চান্দরটি শুধু নতুন, পাঁচগুলো ফাঁসে গেছে কিছু জায়গায়। মোহর ঘরের কোথাও একটা ফুল দেখতে পেল না। দীপ্তর মা বললেন, 'আর কি করা যাবে। ঘরের বউ হয়ে যখন এসেছে তখন সব মানিয়ে নিতে হবে তোমাকে। লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘর সাজায় আমরা তো সেই সুযোগে পেলাম না।'

দীপ্তর বোন বলল, 'কার সামনে এসব কথা বলছ মা, এখনই কথা শুনবে।' 'শোনালে কখন কোথ? তোার বিয়ের সময় কি বরের বাপ শীঘ্রা সিদুরে নেবে?'

মোহর কথা বলছিল না। চুচাপা বাটেই পকেট দাঁড়িয়েছিল।

দীপ্তর মা বললেন, 'ওর একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করে। নিজের বাড়ি। বিশ্বাস শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। সেজ বুড়ির অসুখ, মরল বলে। একেবারে সোনার চাঁদ ছেলে। কিন্তু বিশ হাজার নগদ আর দশ ভরি সোনা, একটা রঙিন টেলিভিশন চেয়েছে। বুঝলে?' ছেলেকে বললাম, শুনে তার মুখ হাড়ি হয়ে গেল।'

'এখন কেউ নগদ চায়?' বিস্ময়ে বলে ফেলল মোহর।  
'কোন জগতে থাকো তুমি? ঘরে বসে অপনমনে বই লিখলে কি এসব জানা যায়? থাকবে, শুনলাম, বই লিখে অনেক টাকা পাছ। ছেলে করা আর তোমার করার মধ্যে তো কোনও পার্থক্য নেই। একটু ভেবে দেখো।' শাশুড়ি বললেন।

জবাব ঠেটে এসে গিয়েছিল কিন্তু কোনওমতে সামলে নিল মোহর। আজ বউ হিসেবে এ বাড়িতে প্রথম দিন। প্রথম দিনেই শত্রুতা তৈরি করার কোনও মানে হয় না।

ছোটবোন বলল, 'কাল তুমি রান্না করবে বউদি। তোমার হাতের রান্না খাব।'  
মোহর হাসল, 'আমি কখনও রান্না করিনি।'  
শাশুড়ি বললেন, 'ওমা! একি কথা। তোমার মা রান্না শেখাননি?'

'বলেছিলেন, আমার রান্না করতে আগ্রহ হয়নি।'  
'একি বলছ? বাঙালি মেয়ে রান্না জানে না, স্বামীকে খাওয়াবে কি?'  
'রান্নাটা যে শুধু মেয়েদের করতে হবে তা তো কোথাও লেখা নেই। স্বামীরও স্বত্বীকে রান্না করে খাওয়াতে পারে।'

'ব্যাটাছেলে রান্না করবে? খোকা কখনও রান্নাঘরে ঢুকেছে?'  
'পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত ঐশ্বর্যই কিন্তু পুরুষমানুষ।'  
'ওসব বুঝি না বাবা। রান্না না করলে খাবে কি? চিরকাল তো আমরা দাসীবাঁদি হয়ে থাকব না। তবু কি হবে?'

'ওকটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নইলে হোটেল তো আছেই।  
এটা কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। মোহরের মনে হল শেখপার্সড সে শত্রুতাটা শুরু করেই ফেলল। দীপ্তকে বলতে হবে কালই একটা রান্নার লোক জোগাড় করতে। ভদ্রমহিলাদের জানানো দরকার শুধু রান্না করার জন্যে তাঁরা পৃথিবীতে জন্মাননি।

সজ্জেলোয় দীপ্ত এল। সঙ্গে কিছু ফুল আর খাবারের প্যাকেট। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। বই পড়ছিলাম।'  
'ওদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে?'  
'হয়েছে। তবে বেশি না হওয়াই বোধহয় ভাল?'  
দীপ্তর কপালে ডাঙ্ক পড়ল, 'কেন? ওরা কিছু বলেছে?'  
কিছু বলেনি। 'হাসল মোহর, 'আচ্ছা, তুমি কোথায় বসে লেখো?'  
'আমার আবার লেখা। এই যাট গুয়েই যা লেখালেখি।'  
'এভাবে বলছ কেন? তোমার কবিতার বই বের হলে দেখো ভাল বিক্রি হবে।'  
'ছাপবে কে?'

'সুধীরাববুকে বলেছি। উনি রাজি হয়েছেন।'  
'না বললেই পারতে। তুমি এখন হটকেক তাই তোমাকে সমস্ত করতে উনি ছাপতে চেয়েছেন। মনে মনে আমাকে গালাগালি দিয়েছেন।'

মোহর দীপ্তর দিকে তাকাল, 'মামুনের মনের কথা কি সহজে পড়ে ফেলা হবে। এসব কমপ্লেক্স ছাড়ো। বই বের হলে দেখবে অন্য প্রকাশকরা তোমার কাছে আসবে।'

'মোহর। বাঙালি কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে যায় বালক বয়সে কিন্তু পয়সা দিয়ে কবিতার বই কেনার লোক হাতে গোনা যায়। গদ্য লিখে একজন লেখক যা আয় করেন, সারাজীবন কবিতা লিখে একজন কবি তার ওয়ান পাসেন্টও রোজগার করেন না। প্রকাশকরা টাকার খলি নিয়ে আসবে আশা করলে গদ্য লিখত কবিরা কিন্তু তাতে পদ্য লেখার অস্বহ্যরটা থাকত না।' দীপ্ত চুলে হাত বোলাল, 'এক আধটা নতুন বিষয় নিয়ে গদ্য লিখলেই বিখ্যাত হওয়া যায়, কিন্তু কবি হতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয় অনেক সময় ধরে।'

'তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ?'

'ব্যঙ্গ করছি না। কিন্তু ব্যঙ্গ সহজে তুমি সাফল্য পেয়েছ। ভয় এখানেই।' মোহরের মাথা গরম হয়ে গেল, 'তুমি এত জেলাস ভাবতে পারিনি দীপ্ত। লোক আমার লেখা পছন্দ করে সেটা আমার অপরাধ? আমি তাদের ডেকে বব্ব, দেখুন মশা! আমি মার চাটে লেখা লিখেছি এক বছরে, মাত্র ত্রাস ওয়ানে পড়ি, দশ বছর পর স্কুল ফাইনাল পাশ করি তারপর আমাকে লেখক বলেন, এই তুমি চাও? তোমার দোষ নেই। এ বাড়ির পরিবেশে বড় হয়ে তোমার মনটা ছোট হয়ে গেছে।'

দীপ্তর মুখ কঠিন হয়ে গেল। নিজেকে সামলালে না। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'আজকের প্রথম তুমি এ বাড়িতে এসেছ, তাই আর কথা বাড়ানলাম।'

দীপ্ত বেরিয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুচুচাপ বসে রইল মোহর। হঠাৎই তার মনে হতে লাগল আর কিছু করার নেই। ভুল যা করার তা করে ফেলেছে। দীপ্তর যে দিকটা তাকে আকর্ষণ করে তাকে পোষে গিয়ে আর একটা দিকের অস্তিত্বকে সে ভুলে গিয়েছিল। এক সঙ্গে বাস করতে হলে প্রতিপদে সেই দিকটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। সেই করার আগে এই সম্বোধনটা কথা তার চিন্তা করা উচিত ছিল। বন্ধু হিসেবে যাকে চাওয়া যায় তার সঙ্গে একধরে সারাজীবন কাটানো যে বেশির ভাগ সময় সম্ভব নয় এটা যে কেন ভাবেনি।

এই ঘরে একটা জানলা আছে। কিন্তু তার সামনে দাঁড়ালে আকাশ দেখা যায় না। একেবারে গায়ে পাশের বাড়ির নোনাদা দেওয়াল ব্যাচাসের পথও আটকে রেখেছে। ঘরে কোনও টেবিল চেয়ার নেই। চেয়ারে বসে লেখার অভাস হয়েছে তার। এখানে থাকতে হলে চেয়ার টেবিল আনতে হবে। মোহরের নজর প্যাকেটগুলো নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দীপ্ত কিন্তু মোড়ক খোলা হয়নি। কথার পেছনে কথা বলে মেজাজ নষ্ট করে চলে গেছে। কোথায় গেল বলে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। সে খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দীপ্তর ছোট বোন দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে প্যাকেটগুলো দিয়ে বলল, 'নাও।'

'এগুলো তো দাদা তোমার জন্যে এনেছে।'  
'আমাকে তো সে কথা বলেনি। বলেছে সবার জন্যে। খেয়ে নিয়ো।'  
'তুমি খাবে না?'

'নাঃ। আমার শরীরটা ভাল নেই। বাথরুমটা কোথায়?'

'ওখানে।' একটা টিনের দরজা দেখিয়ে দিল মেয়েটি। প্রায়-অন্ধকার সেই ঘরটিতে ঢুকেই মোহরের বাবার কথা মনে পড়ল। অম্মদা মুখার্জি বলতেন, 'একটি সভা মানুষ তার টয়লেট এবং বাথরুমকে শোওয়ার ঘরের মত পরিষ্কার রাখে।' বাবা যেন কখনও এ বাড়ির বাথরুমে না ঢোকে। ঢুকলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল মোহর। পাঠে স্পর্শ পেতেই চোখ বুলে দেখল অপরিচিত দেওয়াল, বিছনার চারদ, ছাদ। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই চোখ জুড়ে দীপ্তর মুখ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে সে আঁকড়ে ধরল দীপ্তকে। দীপ্ত চাপা গলায় বলল, 'ছাড়ো। কেউ দেখে ফেলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সে শিখিল হয়ে গেল। কোনও কামনার তাড়নায় নয়, চট করে ঘুম ভাঙায় অতেনা পরিবেশ তাকে ভীত করেছিল বলেই সে চেনা মানুষকে জড়িয়ে ধরেছিল এটা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছে হল না।

‘ঘুমিয়ে পড়েছ, খাবে না?’

‘ভাল লাগছে না।’

‘শরীর খারাপ?’

‘না। তুমি খেয়ে নাও।’

দীপ্ত বেরিয়ে গেল। এই যে তাকে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না দীপ্ত এটা ভাল লাগল মোহরের। ছেলেবেলা থেকেই তার খেতে ইচ্ছে না করলে মা জোর করত না। বাবা বলতেন, মানুষ না খেলে চট করে মরে না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে খাওয়ালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশি জোর করলে যে মেজাজ নষ্ট হয়ে যায় এটা মা জানত। কলকাতায় আসার পর জোর করার লোক কাছে ছিল না, সেটা একটা বাঁচোয়া। দীপ্ত যে পাতি বাঙালির মত খাও খাও করেনি এটাই আজকের লাভ।

প্রায় নিশ্চিন্ত রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে দীপ্ত বলল, এখন তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে, না?’

‘হবে না যদি বাথরুমটা সারাও।’

‘পুরনো বাড়ি। সারাতে গেলে অনেক খরচ।’

‘ভদ্রভাবে থাকতে গেলে খচর করতেই হবে। তাছাড়া একটা রান্নার লোক চাই।’

‘কেন? মা কড়িকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে না।’

‘দেবেন। দাসীবাди হয়ে উনি কতদিন রান্না করবেন?’

‘কি যা তা বলছ! রান্না করাটা মায়ের নেশা।’

‘এসব বলে মেয়েদের আর কতকাল ভুলিয়ে রাখবে?’

‘আসলে মায়ের হাতের রান্না ছাড়া খেতে ভাল লাগে না।’

‘একপুয়েট করার এর চেয়ে সহজ পথ আর নেই।’

‘ঠিক আছে। কাল মাকে জিজ্ঞাসা করব। যদি রাজি হন—’ দীপ্তর হাত মোহরের সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মোহর বলল, ‘একমিনিট।’

দীপ্তর হাত থেমে গেল, ‘কি হল?’

‘মাকে যেমন জিজ্ঞাসা করবে তেমন আমাকেও কি জিজ্ঞাসা করেছ?’

‘কি জিজ্ঞাসা করব?’

‘আমার ইচ্ছে আছে কিনা।’

‘আমি তোমাকে আদর করব না?’

‘করবে। কিন্তু আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে চাপ দিচ্ছ তাকে আদর করা বলে নাকি? কে শেখাল তোমাকে?’ অঙ্ককারে হাসল মোহর।

‘আই লাভ ইউ মোহর। এসব কথাও খেলা আমি জানি না।’

দীপ্ত মোহরকে বুকের ভেতর নিয়ে নিতে চাইল। এবং ওইভাবে মিশে যেতে যেতে হঠাৎ হঠাৎই মোহরের মনে হল দীপ্ত খারাপ পাড়ায় গিয়েছিল। অন্তত একবার যে গিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দীপ্ত যতই বলুক ওর ডুমিকা ছিল একজন দর্শকের তবু সেটাকে সে সরলভাবে নেবে কি করে? এইসব বাজারি মেয়ের কাছে গিয়ে প্রাণেশের শরীরে অসুস্থ এসেছিল। প্রাণেশ সেই ব্যাপারে খোলাখুলি স্বীকার করেছিল। এখন প্রাণেশ এবং দীপ্ত হঠাৎই একাকার হয়ে যেতে লাগল। এবেকারে শেষ মুহুর্তে জোর করে নিজেই সরিয়ে নিল মোহর। হতভম্ব দীপ্ত আতঁনাদ করল চাপা স্বরে, ‘কি হল?’

‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।’

‘কি পারছ না?’ মাথামুণ্ড বুঝতে পারছিল না দীপ্ত।

‘তুমি সোনালিছিতে গিয়েছিলে।’

‘ওঃ, সে তো অনেকদিন আগের কথা।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু তারপর যে আর যাওনি তার প্রশ্রয় কোথায়?’

‘আশ্চর্য! আমি তোমাকে কথা দেবার পর আবার যেতে পারি বলে ভাবছ?’

‘আমি জানি না।’

‘ওঃ মোহর। স্পষ্ট! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। তুমি তো সব ভুলে গিয়েছিলে।’

‘হ্যাঁ। আমার মনে আসেনি কারণ তারপর আমরা এসব কখনও করিনি।’

অসহায় ভাবে দীপ্ত বলল, ‘আমি একবারই গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে এবং গল্প করে চলে এসেছি। জান্‌ট একজন দর্শক।’

‘আমি জানি না।’

‘আমি আর কখনও যাইনি মোহর।’

‘হতে পারে।’

‘তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস না থাকলে—’

‘ঠিক আছে। তুমি ওখানে কিছু করোনি?’

‘না।’

‘যদি করে থাকো তাহলে তোমার অসুখ হতে পারে।’

‘আমার কোনও অসুখ নেই।’

‘আমি পড়েছি। একটা ঘটনার পর কৌতুহলে এ ব্যাপারে কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়েছিলাম। একবার অসুস্থ হলে কি লক্ষ্যণ থাকে তা আমি’

জানি আমি অসুস্থ না হলে লক্ষ্যণ থাকবে কি করে?’

‘আমি নিশ্চিত হতে চাই।’

‘আমি যে বলছি তাতে তুমি নিশ্চিত নও।’

‘সত্যি কথা বললে দরব না। আমার এক মন তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইছে, কিন্তু আরেক মনে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।’

দীপ্ত অঙ্ককারে মোহরের দিকে তাকাল। একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে শব্দ করে। তারপর বলল, ‘ঘুমিয়ে পড়ো।’

‘আমার ঘুম আসবে না।’

‘কেন?’

‘আমি তোমাকে চাই। কিন্তু সন্দেহটাকে ছাড়তে পারছি না।’

‘তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।’

আলো জ্বলল মোহর। দরজা জানলা বন্ধ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে সশব্দে। যেন করেরখার গতি বুকে নিজের ভাগ্য জ্বেনে নিচ্ছে এমনভাবে অজিত বিদ্যা যাচাই করল সে। তারপর সোজা হয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় উচ্চারণ করল, ‘তুমি অসুস্থ হয়েছিলে।’

চোখের ওপর হাত রেখে গুয়েছিল দীপ্ত। কোনও কথা বলল না। প্রাচণ্ড জোরে ওর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল মোহর। বল, আমি ভুল বলছি?’

‘আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।’

‘কিন্তু তুমি অসুস্থ হয়েছিলে।’ পাল্লের মত দেখাচ্ছিল মোহরকে।

‘আই ওয়াজ ড্রাক্ট। আমার কোনও চৈতন্য ছিল না। আমি কি করেছি, আমাকে নিয়ে কি করা হয়েছে তখন আমি বুঝিনি।’ হাত সরানো ছিল না চোখের ওপর থেকে দীপ্ত।

‘তাহলে এতক্ষণ আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছিল কেন?’

‘অতীতের একটা দিনের ভুল, যা প্রায় আমার অজ্ঞাতেই হয়ে গিয়েছিল—’

‘আর ব্যাখ্যা কারো না। তুমি অসুস্থ হয়েছিলে জানার পর তোমার সঙ্গে আমি শুতে পারব না।’

‘কিন্তু আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।’

‘কাল তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। তোমার ফিট সার্টিফিকেট উনি দিলে আমার সমস্যা দূর হবে। আমার মনে হয় আজকের রাত্তি আমাদের আলাদা ঘুমানে উচিত।’

‘আলাদা? এখন আমি বাইরের ঘরে গিয়ে শুতে তোমার সম্মান বাড়বে?’

‘আমার একার কেন, তোমারও তো। আর এটাও তাম্বব ব্যাপার স্বামীশ্রী একসঙ্গে না শুলে পাঁচভুতে কান্নাকাটি করবে। তাছাড়া ওরা যদি শোনে তোমার অসুস্থতা নেই এটা জানার জন্যে আমার আজ রাতে আলাদা শুয়েছি তাহলে কিছু বলবেন না?’

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা চামর টেনে নিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়ল দীপ্ত। তার লেখা কোনও কবিতায় এমন অনুভূতি সে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, ‘আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঠরং কখনও ওসব অসুখ করেনি। এরকম সমস্যা মাথায় ঢুকল কি করে?’

মোহর দীপ্তর দিকে তাকাল। গম্ভীর মুখে বসে আছে দীপ্ত। কিন্তু সে বইতে যেসব লক্ষ্যসের কথা পড়েছিল তার কিছু কিছু গতরাতে দেখতে পেয়েছে। মোহর বলল, ‘আপনি বলছেন?’

ডাক্তারবাবু আবার হাসলেন, ‘একশ ভাগ।’

দীপ্ত তাকালেন, ‘মনে হচ্ছে তুমি হতাশ হলে।’

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি রেডলাইট এরিয়ায় গিয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ। অনেকদিন আগে। গিয়েছিলাম দর্শক হিসেবে। ফিরেও এসেছিলাম সেইভাবে।’

‘মিথ্যা বোলে না।’ মোহর প্রতিবাদ করল।

‘সেটা গতকাল বলেছি। যখন তুমি আমাকে একদম বিশ্বাস করছিলেন না। মনে হয়েছিল আমি অসুস্থ জানলে তোমার ইণ্ডো স্যাটিসফায়ড হবে।’

‘অভুত!’ কোনও মতে উচ্চারণ করল মোহর।

দীপ্ত টাকা বের করে একটা পেশার গুয়েটের তলায় রেখে উঠে দাঁড়াতেই মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘আজ্ঞা, কোনও অসুস্থ মানুষের সম্পর্কে আসার পর কতদিন বাদে সেই রোগের প্রকাশ পায়?’

‘এটা জ্ঞানতে দেবি হয় না। খুব দ্রুত অসুস্থ জানান দেয়।’

‘তার মানে চিন্তার অথবা দশ বছর বাদে এটা মাথা চাড়া দেয় না?’

‘সাধারণত নয়। তবে অনেক সময় ব্যতিক্রমও দেখা যায়।’

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসার পরে মোহরের মনে পড়ছিল প্রাণেশের মুখ। প্রাণেশ তার শরীরে কি দিয়ে গেছে তা এখনও জানে না সে। এতদিন তার কোনও অসুস্থি হয়নি। অসুস্থতার কোনও অভ্যাসও পায়নি। কিন্তু পরে, অনেক পরে যদি কিছু হয়? একবার পরীক্ষা করলে কেমন হত? ব্যাপটা কি দীপ্তকে বলবে? বলা উচিত?

দীপ্ত ঘড়ি দেখল, ‘কফিহাউসে গেল হয়। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে।’

‘না। বাড়িতে চলে।’

‘এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে কি করব?’

‘তোমার সঙ্গে কথা আছে।’

‘তাহলে এখানেই কোথাও বসি।’

‘না। বাড়িতে যাব।’

‘কিন্তু আমার আজকে ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে।’

‘সেটা বাড়িতে বসে করো।’

‘পাগল। ও বাড়িতে সম্ভব নয় তা তুমি জানো।’

‘আশ্চর্য! তোমার বেরকম কোনও প্রাইভেসি থাকবে না?’

দীপ্ত কথা বাড়াল না। একটা টায়রি নিয়ে ওরা ফিরে আসছিল। মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘বাড়িতে তো কিছু নেই, কিনবে না?’

‘না।’

এত তাড়াতাড়ি ছেলে বউকে নিয়ে ফিরবে আশা করেনি বাড়ির লোক। শাশুড়ি দরজা খুলে বললেন, ‘ও তোমরা! আমি ভাবলাম খেয়েদেয়ে আসবে।’

দীপ্ত বলল, ‘আমরা সেকথা তো বলিনি।’

‘বলিসনি। কাল বাইরে থেকে খাবার আনলি, তোর বউ খেল না। আজ দুপুরেও যেন কোনও মতে গিলল। আমাদের রান্না নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি।’

‘প্রথম প্রথম ওরকম হয়। আমার তরিতরকারিতে মিষ্টি খাই, ওরা খায় না।’

মোহর চুচুপা শুনছিল। এই ভদ্রমহিলা কদিনে নর্মাল গলায় কথা বলবেন। শাশুড়ি বললেন, ‘আজ তোর মামা এসেছিল। বলল, দীপ্ত ভাতাবে বিয়ে করল কিন্তু একটা সামাজিক ব্যাপার তো আছে। পাঁচজনকে ডেকে বউভাত গোছের কর একদিন। আমার তো সামর্থ্য নেই। তাকে কথাটা জ্ঞানিয়ে দিলাম।’

‘তুমি কি চাও?’

‘আমার চাওয়ার কিছু নেই। তুই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিস, যা করার তুই করবি।’ ভদ্রমহিলার কথা শেষ হওয়ামাত্র মোহর নিজের ঘরে চলে এল। সে ঠিক করল আজ কোনওভাবে অগড়া করবে না। ভদ্রমহিলা তাঁর এতদিনের ধ্যানধারণা এক কথায় বদলাতে পারেন না। সে চেষ্টা করলে দূরদূরত্ব বাড়া ছাড়া কমবে না।

রাত্রের খাওয়ার নামাযের। এ বাড়িতে টেলিফোনের ব্যবহার নেই খাওয়ার সময়। রুটির সঙ্গে আলুর দম চমৎকার জমে যদি সেটা আলখাল হয়। এই ঘটি বাড়িতে মিষ্টির প্রাবল্য এত বেশি যে আলুর দমও মুখে তুলতে অসুবিধে হচ্ছিল মোহরের।

দরজা বন্ধ করে সিগারেট খরিয়ে দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘আজ পত্রিকার অফিসে কি হল?’

‘আবার লিখতে বলেছে। সেইসঙ্গে একটা ভাল খবর আছে।’

দীপ্ত তাকাল। প্রশ্ন না করে খবরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

‘আমি বোধহয় একটা চাকরি পাইছি।’

‘তাই? বাঃ। ভাল খবর।’ দীপ্ত সিগারেটের ধোয়া ছাড়ল, ‘তখন কি বলবে বলছিলেন?’

‘কখন?’

‘আশ্চর্য! ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে বাড়ি আসতে চাইলে!’

মোহর তাকাল। দীপ্তর কাট কাঠ ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল সে, ‘ভুলে গেছি!’

মাথা নাড়ল দীপ্ত, ‘শুয়ে পড়ুক। আলো নিভিয়ে দিচ্ছি।’ সিগারেট নিভিয়ে চাদরটা টেনে নিল সে। তারপর মেঝেতে সযত্নে পেতে বালিশ ফেলল একদিকে। খাটে বসে দৃশ্যটা দেখছিল মোহর। আলো নিভে যাওয়ার পর সে নিশ্চিন্তা স্নেহে ফেলল। আজ দুপুরে শাড়ি পরে বেরিয়েছিল। অস্বস্তি ছিল খুব। কিন্তু মনের অস্বস্তির কারণে সেটা তখন গুরুত্ব পায়নি। এখন সে একটা ম্যাসি পরে রয়েছে। মনে হল সেটাও অস্বস্তিকর।

উন্মুক্ত হয়ে সে নেমে পড়ল মেঝেতে। দীপ্ত কিছু বলার আগে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেতে লাগল। প্রথমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল দীপ্ত। কিন্তু মোহর ফিসফিস স্তরে বলল, ‘আমি কিন্তু চোঁচাব।’

‘আশ্চর্য! তুমি তো আমাকে সন্দেহ করো।’

‘বেশ করি। আমার যা হচ্ছে তাই করব। তুমি আমার।’

দীপ্ত ভেসে গেল। নিজেকে ভাসিয়ে দিতে যে এক ভাল লাগে তা তার কখনও জানা ছিল না।

প্রতিক্রিয়া চাকরি পেয়ে গেল মোহর। বিশেষ প্রতিনিমি হিসেবে লিখতে শুরু করল যোগ দেওয়ায়। সেগুলো পড়ার জন্যে পাঠকরা সপ্তাহের একটি বিশেষ দিন উন্মুক্ত হয়ে থাকত। সেদিন কাগজের বিক্রি বেড়ে গেল। মাইনে পাওয়ার পর সে অজিত অর্থে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ পাঠিয়ে দিল হলুদপুরে। দ্বিতীয় ভাগ দীপ্তর হাতে তুলে দিয়ে বাকিটা নিজের কাছে রাখল। মোহর দেখল এক জায়গায় অন্নদা মুখার্জি এবং দীপ্তর মধ্যে মিল হল। ওরা কেউই প্রথমে টাকা নিতে চাননি। জোর করায় নিলেন।

এর মধ্যে এই ঘরে একটা টেলিভি টেলিভি টেলিভি টেলিভি জায়গা কমছে। কাগজ থেকে বলেছে ফোনের ব্যবস্থা করে দেবে। বাথরুমটাকে সারানোর কথা প্রায়ই বলে মোহর, দীপ্ত ই হা করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ বাড়ির মানুষদের বন্ধু হতে পারল না মোহর। দীপ্তর দিদির স্বপ্নবাজি হাওর। কিন্তু তিনি প্রায়ই বাপের বাড়িতে চলে আসেন। তাঁর খামিকে প্রায়ই টুর করতে হয় এবং সেইসময় শান্তিগিরি গল্পনা তিনি সহ্য করতে পারেন না। দীপ্তর মা তাকে বলেছেন, ‘তোমার কপাল ভাল যে ওরকম জীবাণ্ড মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েনি।’ দীপ্তর দিদির এ বাড়িতে একমাত্র কাছ হল গায়ে পড়ে ভাব করার ছলে সমালোচনা করা। দীপ্তর ছোটবেলা একেবারে মায়ের আদলে। কিন্তু সুযোগ পেলেই সে মোহরের কাছে পাঁচ দশটাকা চাইবে। মোহর নিজেও থাকে। সে এখনও স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনার চাইতে হিন্দি সিনেমা এবং একাধিকবার ফ্রেন্ড তাকে আকর্ষণ করে বেশি। সে যে টাকা চাইছে তা দীপ্তকে বলতে নিষেধ করেছে। বলা প্রয়োজন মনে করেনি বলেই মোহর বলেনি।

দুপুরে রয়াল ক্যালকাটা টার্ক ক্লাবে গিয়েছিল মোহর। কলকাতার কত লোক রেস খেলে এবং তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো কি রকম, খেলাট কতখানি গোপন রাখে এবং হারজিতের পরিমাণ কি রকম সেটা লিখবে সে। রেস হবার আগে জরুরি অথবা ট্রেনাররা জানতে পারে কিনা, কোন ঘোড়া জিতবে তার সম্ভাবন নেওয়াও উদ্দেশ্য ছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে গাড়িতে বসে হঠাৎ নন্দদেব দেখতে পেল। একটা ছেলের হাত ধরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আজ সকালেই মেয়েটা তার কাছ থেকে দশ টাকা নিয়েছে। মোহর গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকল।

‘গাছের নীচে জোড়ায় জোড়ায় যুবকযুবতী কিশোরী এই চড়া রোদেও বসে আছে। এই যে মোহর হেঁটে যাচ্ছে তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। একটি ছেলে যেন তাকে দেখিয়েই সঙ্গিনীকে চুমু খেল। কোনো কোনাও গাছের নীচে একাধিক জোড়া একসঙ্গে প্রেম করছে।’

দীপ্তর বোন এবং ছোটটিকে আবিষ্কার করতে গিয়ে থতমত হয়ে গেল মোহর। একটি নয়, ওর দুপাশে দুটি ছেলে বসে আছে। দুজনকেই লক্কা পায়রার মত দেখতে। দুজনের হাত মেয়েটার দুই কাঁধ পেঁচিয়ে আছে। মোহর সোজা ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা কিছু কিনতে পারব না।’

ততক্ষণে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফ্যাকাশে।

মোহর বলল, ‘চলো আমার সঙ্গে।’

ছেলে দুটো উঠে দাঁড়াল, ‘কে রে?’

‘আমার বউদি।’

‘ভ্যাট! বউদি ফুডি দ্যাখান।’ ট্যারি করে এনেছি, রেপ্টুরেটে বাইয়েছি আর এখন বউদি দ্যাখাচ্ছে। আপনি কেটে পড়ুন।’

‘তোমরা কোথায় থাকো?’ মোহর শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

‘আপনার কি হবে জেনে?’

‘এমন মার মারব যে সবকটা হাড় ভেঙে দেব শুন্নার।’ হিস হিস করে উঠল মোহর।

ওর বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যে ছেলদুটো কথা বাড়াল না। মোহর নন্দদের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল বাইরে, ‘তুমি স্কুলে যাও এই করতে?’

‘বেশ করি।’ হঠাৎ পাশটে গেল মেয়েটা।

‘ঠাস করে চড়ে মারল মোহর, ‘আবার মুখ মুখে কথা হচ্ছে।’

‘আমাকে মারলে কেন? তোমার কি রাইট আছে আমাকে মারার? তুমি দাদার সঙ্গে প্রেম করো নি। দাদার সঙ্গে শুয়েছিল বলে দাদা তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। এক পয়সা নগণ কি ফানিচার, কিছুই পায়নি মা। যার জন্যে আমার বিয়ে হয়তো কোনওদিন হবে না। আমাদের সর্বনাশ করে আবার হাত চালাচ্ছে।’

পাশর হয়ে গেল মোহর। কথা শেষ করে মেয়েটা হাঁটতে লাগল বিভলা প্ল্যান্টেটোরিয়ামের দিকে। ওকে এভাবে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক নয় কিন্তু আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না মোহরের। ওকে বাঁধা দিতে গেল আবার অপমান করবে।

কাজ করতে ইচ্ছা করছিল না আর। অফিসে ফিরে এসে সে দীপ্তকে ফোন করল। দীপ্ত খুব ব্যস্ত ছিল, জিজ্ঞাসা করল, ‘হঠাৎ কি হল?’

‘না। এমনি।’ টেলিফোন নামিয়ে রাখল মোহর। দীপ্তকে ডিস্টার্ব করার কোনও মানে হয় না।

কিন্তু মেয়েটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটাও মনো দায় না। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল মোহর। শান্তিগিরি দরজা বুলল, ‘শোন বউমা, যদিইন এ বাড়িতে আছ এসব চলবে না। মেয়েছেলে চাকরি করতে বাইরে যাচ্ছে বলে সাপের পাঁচ পা দেখবে তা হবে না।’

‘আপনি কি বলতে চাইছেন?’

‘আজ একটা মাতাল তোমার খোঁজে এসেছিল। তোমার সঙ্গে নাকি তার খুব ভাব। এসব কি? আমার এই পাড়ার অনেক পুরানো লোক। আমাদের সম্মান নষ্ট করে কি লাভ তোমার?’

‘মাতাল এসেছিল?’

‘হ্যাঁ। ভাগ্যিস বুকির সঙ্গে গলিতেই দেখা হয়ে গেছে। তোমার নাম বলতে শুনে ও এগিয়ে গিয়েছিল। নইলে বাড়িতে এলে কি কলঙ্কারি হত।’

‘আপনি লোকটাকে দেখেছেন?’

‘না। দেখার সাধ নেই বাপু।’

‘খুকি ছাড়া আর কেউ দেখেছে?’

‘নিশ্চয়ই দেখেছে। পাড়ায় এসে যখন জিজ্ঞাসা করছিল—’

‘আপনার খুকিকে ডাকুন।’

শাশুড়ি চিংকার করে ডাকলে ছোট নন্দ ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

‘তুমি ছাড়া লোকটাকে কে কে দেখেছে?’

‘ছোট ওস্তাল মেয়েটা, ‘আমার মনে নেই।’

‘শোন। আমার খোঁজে কেউ আসেনি। দুপুরে তুমি ধরা পড়ে গেছ বলে বাড়িতে ফিরে মিথ্যা

গল্প বানিয়েছ। মিথ্যা কথা শুনলে আমার মেজাজ গরম হয়। গরম হলে কি করি তা আজ তুমি

জেনেছ। সত্যি কথা স্বীকার কর।’

‘ও মিথ্যা বলেছে। আমার মেয়েকে মিথ্যাবাদী বলছ তুমি?’

‘শুনুন। আপনার মেয়ে আজ দুপুরে ভিক্টোরিয়াতে দুটো বদ ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে

গিয়েছিল। আমার চোখে পড়ায় ওকে বাইরে নিয়ে আসি। মনে হয় ও স্কুল পালিয়ে প্রায়ই এসব

করে। আপনি খোঁজ নিন।’ মোহর শান্ত হবার চেষ্টা করছিল।

‘ছি ছি ছি। তুমি ঘরে পড়ে আমার মেয়ের চরিত্র নিয়ে গল্প বানাচ্ছ?’

‘আমি সত্যি বলছি।’

হঠাৎ মেয়েটি ছুটে এল সামনে, ‘প্রমাণ কর, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি আজ

ছেলেদের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় গিয়েছিলাম।’

মোহর হঠাৎ অসহায় বোধ করল। কোন ছেলে তারা সে জানে না। সাক্ষী রেখে ওকে বাইরে

নিয়ে আসেনি সে। হঠাৎ তাদের অফিসের ড্রাইভারের কথা মনে পড়ল। গাড়িতে বসে নিশ্চয়ই

লোকটা সব দেখেছে। মোহর বলল, ‘ঠিক আছে। আমাদের ড্রাইভারকে ডেকে পাঠাচ্ছি।’

‘তোমাদের ড্রাইভারকে তো শিখিয়ে রেখেছ?’

‘ও ঠিক আছে। কাল তোমার স্কুলে যাবে। প্রমাণ জোগাড় করতে বেশি দেরি হবে না

আমার।’ মোহর কথা শেষ করতেই শাশুড়ি তাঁর ছোট মেয়ের চুল মুঠোয় ধরলেন, ‘আবার

জুটিয়েছিস? কত করে নিষেধ করেছি, বুঝিয়েছি তবু স্বভাব শোধরাল না সে। কেঁদে ককিয়ে শাশুড়ি

ছেলের কাছে কি বলছেন তা শোনার প্রবৃত্তি হল না তার।

দীপ্ত ঘরে ঢুকল বানিক বাদে। ঘর অন্ধকার দেখে জিজ্ঞাসা করল, ‘ঘুমিয়ে পড়েছ?’

‘না।’

‘এসব কি হচ্ছে?’

‘তোমার মাবোনের ভার্সন শুনে এলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, আমি হয়তো উল্টো বলব।’

‘তোমার বক্তব্যটা শোনা যাক।’

‘বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু না বললে ভুল করা হবে।’ মোহর উঠে বসল।

আজকের দুপুর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সে যেভাবে দেখেছে সেইভাবে বলতে লাগল। তার

গলার স্বর স্বাভাবিক ছিল না। এবং সে শেষ করা মাত্র বাইরের বারানদায় চিংকারটা ছিটকে উঠল, ‘মিথ্যা কথা। আমার মেয়ে যদি ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে থাকে তাহলে তুমি সেখানে কি করতে গিয়েছিলে? ভরদুপুরে সেখানে তোমার কি কাজ ছিল? ঘরে একলা পেয়ে আমার ছেলের মন তুমি ঘুরিয়ে দিতে পারো না।’

দীপ্ত দরজার সামনে গেল, ‘মা, কি হচ্ছে? চুপ করো। পাড়ার সবাই শুনছে।’

‘শোনার আর বাকি কি আছে? আমি তো কান পাতেতে পারি না। তোমার বউ প্যান্ট সার্ট পরে কেন? ছেলেনের মত চুল ছাটে কেন? ব্যাটাছেলের মত গটগটিয়ে ছাটে কেন? কার ঘরের বউ এমন কাঠখোঁটা হয় রে!’

‘কে কি বলল তাতে কান দেবে কেন? নিজেরা মিলেমিশে থাকো। যাও, ঘরে যাও। খুকি কোথায়? সে আমার সামনে এসে বলুক ভিক্টোরিয়ায় যায়নি।’

‘আমি তাকে যা বলার বলেছি তুমি আর বলিস না।’

‘তুমি আর প্রশ্ন দিয়ে না মা। হঠাৎ এমন বিপদে পড়বে যে কুল থাকবে না।’ দীপ্ত ঘরে ফিরে এসে আলো ছালল, ‘তোমার অফিসের কোনও সহকর্মী আসতে পারে। আজকাল কে কি করবে ফোরকাস্ট করা সম্ভব নয়।’

‘দীপ্ত। আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়।’

‘তার মানে?’

‘নতুন কোনও ক্র্যাট দ্যাখো।’

‘ইমপসিবল। এদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘আমি এতদিন এ বাড়িতে অনেক অপমান চূষাপা সহ্য করেছি কিন্তু আজ যা হল তারপর এখানে থাকলে নিজেকে একটা কীট বলে মনে হবে।’

‘ওঃ। ইগনোর করো। এদের মাথার ঠিক নেই।’

‘হ্যাঁ। এখানে থাকলে আমারও মাথা ঠিক থাকবে না।’ জোর গলায় বলল মোহর, ‘সামনের

মাসেই একটু ভ্রমভয়ে থাকার জায়গা পেতে হবে।’

‘দ্যাখো মোহর, এদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘তোমার স্ত্রীর সম্প্রদায় আগে না এখানে এদের সঙ্গে থাকটা জরুরি?’

‘দুটোই।’

‘দুটো যখন তুমি পারছ না তখন আমরা চেষ্টা করবই।’

‘তোমার মাথায় কেন ঢুকছে না এ বাড়িতে এখন আমি একমাত্র রোজগার করি। এরা আমার ওপর নির্ভর করে আছে। এরা অশিক্ষিত, নির্বোধ কিন্তু আমার মা বোন। আমি ওদের হঠাৎ পাথে

বসিয়ে চলে যেতে পারি না।’

‘তোমার চাকরি পাওয়ার আগে এদের চলত কিভাবে?’

‘বাবার রেখে যাওয়া টাকা ভাঙিয়ে। জামাইবাড়ী সাহায্য করত।’

‘তুমিও করবে। তোমার মাইনের টাকার সমস্টাইট এখানে দিয়ে দিয়ে। আমার টাকায় ঠিক

ম্যানেজ করে নিতে পারব। ঠিক আছে?’

‘তুমি এখন রেগে আছ, পরে কথা বলব।’

‘নো। আমি রেগে গেলেও নব্বালি আছি।’

‘বেশ। ব্যাপার লাগলেও একটু মানিয়ে নাও।’

‘দীপ্ত, আমরা ঘিরে করেছিলাম একসঙ্গে থাকব বলে। তোমার মত পুরুষের সূর্য্য করতেনাও

না স্ত্রীকে, এটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।’

দীপ্ত জবাব দিল না। সেটা লক্ষ্য করে মোহের বলল, 'ইন দ্যাট কেস আমাকে একাই যেতে হবে। তুমি তাহলে এদের নিয়ে থাকো।'

'কি যা তা বলছ?'

'আমি স্পষ্ট বলছি। আমি যখন ওদের আর সহ্য করতে পারছি না তখন এ বাড়িতে থাকব কি করে? তুমি যখন ওদের ছেড়ে যেতে পারবে না তখন আমাকেই একা যেতে হবে। এর মধ্যে কোনও গোঁয়ামাল নেই।'

'মোহর, লোক তোমার নিদ্দে করবে।'

'ওতে আমি ধাপালাক থেকে অভ্যস্ত। কি বলবে, মেয়েটা এত বদ যে শাওন্ডি ননদের সঙ্গে মনোতে পারল না। বদ বলেই স্বামীও সঙ্গে গেল না। এর বেশি কিছু বললেও আমার আপত্তি নেই। আলোটা নেভাও।'

দীপ্ত এগিয়ে এল, 'আমি মাকে বলব যাতে একটু ভাল ব্যবহার করেন।'

'দ্যাখো, তোমার মত মাৎসোপাধ্য বালকের সঙ্গে কথা বলতে আমার ধূগা হচ্ছে। তেমন্না স্ত্রীকে আপস করতে বল অথচ মা বোনকে সন্তোষান্বিত করার চেষ্টা করো না। তোমার মা যেভাবে তার মেয়েকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার পরিণতি ভিনিই ফেস করবে। আমার এতদিনের শিক্ষা সৎস্বাক্ষরকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই পরিবেশে থাকতে আমি পারব না। মা শব্দটার মানে বিনাশর্তে তার কাছে মাথা নেয়া বলে যারা মনে করে আমি তাদের দলে নই। মায়ের গায়ে নোরা লেগে থাকলে তাকে সুন করিয়ে তবে জড়িয়ে ধরতে পারি।'

পরপর কয়েকদিন ধরে একই কথাবার্তা ঘুরেফিরে হচ্ছিল। দীপ্ত এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না। তার আত্মীয়স্বজন ধারাপ কথা বলবে এবং নিজের কাছেও ছোট হয়ে যাবে বলেই যাবে না। সে যাবে না এবং মোহরকেও যেতে দেবে না। বাধা পাওয়ার আগে একরকম ছিল, বাধা পেয়ে মোহর মরিয়া হয়ে উঠল। অফিসের একটা গেস্ট হাউস আছে সল্টলেকে। সেখানে কিছুদিন থাকার অনুমতি নিল সে। কলকাতা শহরে মহিলাদের উদ্ভাবনে থাকার ব্যবস্থা এত কম যে মেয়েদের বাধ্য হতে হয় অপমান সহ্য করে থাকে যেতে। কাজে পেইং গেস্টের বিজ্ঞাপন দেখে সে হাজরা রোডে গিয়েছিল। একটি ঘরে তিনজন মেয়ে রয়েছে, তাকে চতুর্থজন হতে হবে। পাখা একটাই, বাথরুমও একটি। সকালে চা এবং ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাবার দেবে না, রাতে ডিনার। কোনও গেস্ট আনা চলবে না এবং রাত সাড়ে নটার মধ্যে গেট বন্ধ হয়ে যাবে। এর বদলে তাকে আঠারোশো টাকা দিতে হবে। মোহর একা থাকাই ভাল মনে করায় গেস্ট হাউসে মাস তিনেক থাকবে বলে ঠিক করল। এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতেই হবে।

তিরিশ তারিখে মোহর দীপ্তকে বলল, 'আমি কাল সকালে চলে যাব।'

'তুমি ভুল করছ।'

'সেটা সময় বলবে। আমি তোমার জন্য তিনমাস অপেক্ষা করব। যদি আসতে পার তাহলে খুশি হব।' মোহর শান্ত গলায় বলল।

'যদি না পারি—?'

'তিনমাস পরে চিন্তা করে তোমাকে জানাব।'

'মোহর, তুমি এত অ্যাডামেন্ট! একটুও অ্যাডজাস্ট করতে পারো না?'

'সবাই তো সব কিছু পারে না। এ বাড়িতে আমার অনেক অসুবিধে হত। খাওয়া থাকা ব্যবহার—কই এ নিয়ে তো তোমাকে কখনও বিরত করিনি। আজ এতগুলো মাসেও তুমি বাথরুমটা সারাতো পারলে না কারণ তোমার মা ওতেই অভ্যস্ত।'

'কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে যাবে শেষপন্থ। আমাকে তুমি চাও না?'

'চাই। চাই বলেই সঙ্গে যেতে বলছি। চাই বলেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু আমার চাওয়া যদি তোমার কাছে সম্মান না পায় তাহলে পাশোপাশ হয়ে থাকতে আমি কোনমতেই রাজি নই।'

পরদিন ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দীপ্ত। একটু বেলা হলে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল মোহর। সুটকেশ দুটো ট্যাক্সিতে তুলে সে ফিরে এল ভেতরে। দীপ্তর মা রান্না করছিলেন। মোহর বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

অদ্ভমহিলা উত্তর দিলেন না। একটু অপেক্ষা করে মোহর ট্যাক্সিতে উঠে বসল। আসনে শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, 'চলুন।'

সেই রাতে গেস্ট হাউসের সুন্দর ঘরে একলা মোহরের মনে হয়েছিল পৃথিবীর মানুষের মন থেকে আবেগ জাতীয় অনুভূতি দ্রুত কমে যাচ্ছে। নইলে আজ তারা যে যার নিজের মন করে কষ্ট পেত। চলে আসার মুহূর্তে তার যে খারাপ লাগা ছিল এখন সেটা ভেমন করে নেই। যা নিয়েছে যা হয়েছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না। উল্টে এমন ভাবনাও আসছে, দীপ্ত এটাই চাইছিল। তার চালচলন, জীবনযাত্রা, ব্যাতি এবং চাকরি একে অবশ্যই বিভ্রান্ত করছিল। বিয়ের আগে দু'থেকে যেটা আকর্ষণ করেছিল একসঙ্গে থাকতে গিয়ে সেটা অসহ্য হয়ে যেতে পারে। ওর মা এবং বোনের ব্যবহার চোখে দেখেও দীপ্ত চূপ করে থাকেছে, তাকে মানিয়ে নিতে বলেছে। সে যে একটু একটু করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে তা জেনেও প্রতিবাদের চেষ্টা করেনি। মাঝেমাঝে শরীরের প্রশংসায় ভরিয়ে দিত দীপ্ত। কিন্তু সে চলে আসবে জানা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মা যাওয়ার জন্যে মিনমিনে অনুরোধ করা ছাড়া একটুও জোর করেনি। মোহরের মনে হল এই ভাল হয়েছে। সে নিজেও তো দীপ্ত সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আই নিড ইউ দীপ্ত কথাটা কি আর তেমন করে উচ্চারণ করতে পারবে এখন?

দুদিন বাদে দীপ্ত ফোন করল, 'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'আমি এটা চাইনি মোহর।'

'আমিও না।'

'তাহলে?'

'মাঝে মাঝে ফোন করবে। আর যদি—', থেমে গেল মোহর। দীপ্তকে আসতে বলতে কোথায় যেন কুঠা লাগল এখন। নির্লজ্জ মনে হবে নিজেকে।

'রাখছি।' লাইনটা কেটে গেল দীপ্ত। খুব বিরক্ত হল মোহর। আর যদি বলতে কি বলার ছিল তা জ্ঞাতেই চালল না লোকটা। জানলে অবশ্যি হবে, এটা কি জানত?

এখন দিনরাত কাজ এবং ফাঁকে ফাঁকে ফ্ল্যাট কোষা। বাঙালির চরিত্র অনুযায়ী এখন মোহরবিরাগী মানসিকতা তেমন প্রখর নেই। সামনে নির্বাচন নেই বল রাজনৈতিক দল তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। এইসময় তার প্রবন্ধ রচনা হল পরিকায়, 'পঞ্চাশে আপনি কতখানি বন্ধা?'



আবার গুঞ্জন উঠল। মোহর লিখল আগে চল্লিশ বছর পার না হতেই মেয়েদের শাড়ির রং সাদার দিকে যেত। শাড়ি পরার ধরনের আর অসিআট ভঙ্গি থাকত না। এখন সেটা হয় না। এখন আপনি পঁচিশের তরুণীর ভঙ্গিতেই শাড়ি পরেন তবে রং রাখেন মোলায়েম করে। কিন্তু মহাশয়া, যেহেতু তেরো বছর বয়স থেকে একটির পর একটি সন্তান ধারণ করতে আর বাধ্য নন তাই শরীরের ব্যাক্ষ ফুরিয়ে যায় না। অথচ নিজের মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে তথাকথিত মা মা ভাবটি ফুটিয়ে, তুলতে চেষ্টা করেন বাধ্য হয়ে। আপনার বাহাল বছরের স্বামী কিন্তু কুঁচি চাওলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে হেঁটে যাওয়া যুবতীর শরীর চোখে দাখেন। বন্ধুদের সঙ্গে আগের মত খিঁচিখিঁড়ি করেন। রাত দশটা এগারটায় মদ্যপান করে বাড়ি ফেরেন। তাঁর জীবনযাপন একই রয়ে গেছে। আপনার কি যায় পড়েছে সম্মানসিঁনি সারার? আপনার ছেলে বা মেয়ে একটি বুড়ি বুড়ি মা, যা বাংলা সিনেমায় এখনও চলে আসছে দেখতে চায় নাকি বন্ধুর মত আপনাকে পেতে আগ্রহী এটা কখনও ভেবেছেন? পক্ষাশ পেরিয়ে যাওয়া প্রচুর পুরুষ বিয়ে অথবা প্রেম করছেন, এদের খবর কাগজে পড়ে টেট বঁকিয়ে বুড়ো বয়সে ভীমরতি বলার দিন যে শেষ হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে তাই তার কাজকর্মগুলো আর এক ভায়াগায় পড়ে থাকবে না। ধরা যাক, প্রেমট্রুম অথবা বিয়ে আপনার ভাল লাগে না কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে না নিয়ে আর পাঁচটা বাইরের কাছে নেমে পড়ুন না। যা ছিল একসময় পক্ষাশে অবশ্যই তা এখন অন্তত সন্তোর গিয়ে ঠেকছে। আপনার মা কত বছর ব্যস্ত নাকি দিয়ে দুবেলা জপ করতেন, আপনাকে আদর্শ দীক্ষার কথা ভাবতেই পারেন না। নিজেকে ভোলাবার জন্য ধর্মচরণের মুখোশ পরার কোনও প্রয়োজন আপনার নেই।

লেখাটি অনেককই বিরক্ত করল। বিরূপ চিঠিপত্র ছাপা হতে লাগল। কিন্তু সিল্লির একটি কপজ তার প্রকাশিত লেখাটির অনুবাদ ছাপল। মোহর বুঝতে পারছিল তাকে বিতর্ক তুলতে হবে সবসময় নইলে লোকে ভুলে যেতে দেরি করবে না। তার সব লেখাি পত্রিকার সম্পাদকের ভাল লাগত না। উদ্দেশ্য যেখানে নগ্ন সেই লেখা লিখতে নিষেধ করতেন তিনি। তখন সাফল্যের নেশায় এত মশগল এইসব উপদেশ পছন্দ করত না। এইসময় তার পরিচয় হল এক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। ভদ্রলোক পক্ষাশের গণ্ডিতে পৌঁলেগে আচার আচরণেও ফুলক আছেন। খুব প্রভাবশালী সেই কাগজের বিশেষ প্রতিনিমির চাকরি পেতে অসুবিধে হ'ল না মোহরের। সম্পাদকের কল্যাণে পার্ক স্ট্রিট পাড়ার একটি অতিথাল ফ্ল্যাট আয়ত্তে এসে গেল। তার প্রথম লেখার নাম 'ভারতীয় সিনেমা এবং আবাস্ত মহিলারা।' মেয়েদের ছবিতে ব্যবহার করা হয় যে কম্পানায় তা শুধু যৌনসুখ মেটানোর জন্য—এই ছিল বিষয়। সেটা লিখতে গিয়ে মোহর কোনও আগল রাখল না। দ্বিতীয় ইংরেজি রচনার নাম, 'অল পারপাস মেইডসার্ভেট'।

সম্পাদক রবিন মুরহেড সুদর্শন এবং তিনবার বিবাহবিচ্ছেদ। নারীর প্রতি আকর্ষণ তাকে সবসময় চক্কল রাখে। প্রায় প্রতিটি পার্টিতে তাকে মোহরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শহরে এ নিয়ে কথা বলার লোকের অভাব নেই। ইতিমধ্যে তারই উদ্যোগে একতরফা ডিভোর্স পেয়ে গেছে মোহর। রবিন যখন বিয়ের প্রস্তাব দিল তখন সে একটিই শর্ত দিয়েছিল, রবিনকে তার ফ্ল্যাটে এসে থাকতে হবে। রবিন আপত্তি করেন।

ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখার হাত মোহরের ছিল না। সেগুলো অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হত। প্রতি সপ্তাহে একটি করে রচনা লেখা এবং তার আকর্ষণ বজায় রাখা যে বেশ কষ্টকর তা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না মোহরের। কিন্তু সে হয় মানতে রাজি নয়। এই যে দীপ্তর সঙ্গে বিচ্ছেদ, সেটা অম্লমধা মুখাঞ্জি মানতে পারেননি বলে হৃদপদমে যাওয়া প্রায় কয়েকই দিনেছিল। রবিনকে বিয়ে করা ব্রাহ্মণ পরিবার সহ্য করতে পারেনি। সে লিখল, 'পিতৃপুরুষের চাপানো ধর্ম মানতে আমি রাজি নই।' লেখাটি শেষ হয়েছিল এই বলে, বড়চোয়াল তিরিশ বছর নারী তার যৌবন

উপভোগ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের নিয়মকানুন অনুযায়ী সে ব্যাপারটাকে লজ্জাজনক ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করতে ভালবাসে। এইটু তার মা দিদিমার কাছে সে শিখেছে। আমার প্রথম স্বামী জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। ভদ্রলোক লুকিয়ে চুরিয়ে সোনাগাছি পাড়ায় গেলেন বাড়িতে আমার সঙ্গে একত্রিত হবার সময় মুন্সের ভাব এমন করতেন যেন মনে হত পাপকর্ম করছেন এবং আনন্দিত হবার সময় আমার কথা চিন্তাও করতেন না। সারা জীবন আমাকে ওই চাপ বহন করতে হত যদি বিবাহ বিচ্ছেদের পর আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করতাম। আমার দ্বিতীয় স্বামী জন্মসূত্রে খ্রিস্টান এবং আমার কথা ঝেয়ালে রাখেন। মনে রাখতে হবে এঁরা দুজনেই পূর্বপুরুষের সূত্রে পাওয়া ধর্মের কোনও নিয়মকানুন পালন করেন না।

পরের রচনা 'পুরুষদের পক্ষে সেকুলার হওয়া সম্ভব নয়।'

যেহেতু ইংরেজি কাগজ তাই সারা দেশে মোহরের নাম ছড়িয়ে পড়ল। এবং দুর্নামও। দেশের বিবির আলোতে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল। মামলাগুলোর মূল বিষয় একটাই। সে অথবা এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামাজিক বুনয়াদকে ভেঙে ফেলতে উৎসাহিত করছে। তার লেখাগুলোয় প্রকাশ্যে অশ্লীল উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা রয়েছে। তার দ্বিতীয় ইংরেজি বই, 'উত্তম্যান ইজ নট এ ফোর লেটার ওয়ার্ড' বিদেশেও পৌছে গেল।

এখন মোহরকে প্রায়ই বোম্বেয় দিল্লি করতে হয়। বি বি সিতে তার ইন্টারভিউ এবং বই পড়ে লন্ডনের একজন নারী সম্পাদক সরাসরি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখানে যাওয়ার জন্যে। এবং তখন থেকেই রবিনের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু। চতুর্থ শ্রীর উক্ত আশা যে ওই পর্যায়ে যাবে তা ভদ্রলোক ভাবতে পারেনি। মোহরের শরীর তাকে তৃপ্ত রাখত কিন্তু মোহর যখন শহরের বাইরে যেত তখন অন্য নারীর সঙ্গ তার খারাপ লাগত না। কথাটা মোহরের কানে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। লন্ডন থেকে ফিরে এসে সে রবিনের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিল। কথা হচ্ছিল পত্রিকার অফিসে রবিনের চম্পারের বসে। রবিন অবাক হল, 'এটা কি?'

'বুঝতেই পারছি।'

'চাকরি ছেড়ে দিতে চাও? অন্য কোথাও জয়েন করবে?'

'হ্যাঁ। লন্ডনে আমি একটা ভাল অফার পেয়েছি।'

'মাই গড! তুমি ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে?'

'যেতে হচ্ছে। শুধু বাঙালি অথবা ভারতীয় মেয়েদের জন্যে না লিখে পৃথিবীর মেয়েদের জন্যে লেখা কি অনেক বেশি কাম্য নয়? মোহর হাসল।

'ওয়েল, তুমি যদি ইন্ডিয়া ছেড়ে যাও তাহলে আমাদের সম্পর্ক কি হবে?'

'আমরা বন্ধু হয়ে সারা জীবন থাকতে পারি।'

'দুজন দুই মহাদেশ থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে?'

'নাই বা থাকল।'

'ও। তুমি ডিভোর্স চাও?'

'আই ডেন্ট মাইন্ড।'

'তোমার সম্পর্কে অভিযোগ ছিল নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া তুমি কিছু বোঝো না। এখন দেখছি অভিযোগটা মিথ্যা নয়।'

'না। কিন্তু আমি চলে গেলে তুমিও তো বেঁচে যাবে।'

'কি বলতে চাও?'

'আমি না থাকলে তোমাকে সঙ্গ দেবার মত নারীর অভাব নেই। এখন আমাদের পরস্পরকে আর প্রয়োজন নেই। আমরা যা পাওয়ার পেয়ে গেছি।'

রবিনের মুখ দেখে মনে হল তার এই মুহুর্তে খারাপ লাগছে। সে বলল, 'একটা অনুরোধ করব। তুমি ইন্ডিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে যেন কেউ জানতে না পারে আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। ব্যাস, এটুকুই।'

পরের দিন সকালে গাড়ি নিয়ে হলদুপুরে চলে এল মোহর। সারাতা পথ একটা গাড়িতে বসে অনেকের মুখ মনে করছিল সে। লন্ডনে চলে যাওয়ার আগে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়। রবিনকে বিয়ে করার পর হলদুপুরে আসা হয়নি। অন্নদা মুখার্জী পছন্দ করেননি বলেই আসনি। আজ কি করবেন তিনিই জানেন। এবার শাড়ি পরে এসেছে মোহর। শাড়ি পরলে তুলের অভাবটা বড় মনে আসে।

অন্নদা মুখার্জী এখনও স্কুলে আছেন। দিনটা রবিবার। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে মোহরের মনে হল কোনও কিছুই বদল হয়নি। বারান্দায় উঠে খোলা দরজা দিয়ে বাবাকে দেখতে পেল। খবরের কাগজ পড়ছেন, 'তুই?'

'এলাম।' সোজা চেয়ারে বসল মোহর।  
সে লক্ষ্য করেছিল অন্নদা মুখার্জীর মুখে যে ঐচ্ছন্দ্য এসেছিল তা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। এখন যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন অল্পলোক, 'কি ব্যাপার?'

'দেখা করতে এলাম। আমি লন্ডনে চলে যাচ্ছি।'  
'চলে যাচ্ছিস মানে?'

'ওখানে চাকরি পেয়েছি। অনেকদিন হয়তো আসা হবে না। মা কোথায়?'

প্রশ্ন করাযাত্রা যাকে দেখতে পেল মোহর। শক্ত মুখে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন। সে উঠে মায়ের সামনে গেল, 'তোমাকে সারা জীবন জ্বালালাম, কি কপাল।'

মা কোনও জবাব দিল না। অন্নদা মুখার্জী বললেন, 'তোকে একটা প্রশ্ন করব মোহর। তুই যা লিখিস তা মন থেকে বিশ্বাস করিস না, না?'

'অবশ্যই করি।'  
'না করিস না। সব মিথ্যে কথা। ভান। নইলে নিজের মাকে সুখী করতে চাইতিস।'

'আমি উত্তর দেব না। দিলে তোমাদের খারাপ লাগবে।'  
'কোনও উত্তর তুই দিতে পারবি না। বললে বানানো কথা বলবি। দীপ্তকে তুই বিয়ে করলি, আমরা বাধা দিইনি। অথচ বারবারের লেখা সন্তেও তাকে এখানে নিয়ে এলি না। উল্টে তাদের বিয়ে কেড়ে গেল। শুনতে পাই তার ব্যবহার তার মা-বোন মেনে নিতে পারেনি। অথচ তুই মেয়েদের জন্যে লিখিস। তারপর একজন খ্রিস্টানকে বিয়ে করলি—।'

'ভ্রমলাকের একমাত্র অপরাধ তিনি খ্রিস্টান, তাই তো?'

'না। সেটা কখনও অপরাধ হতে পারে না। শেকসপিয়ারকে আমি সারাজীবন মাখায় করে রাখব। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমি আমার সংস্কার মেনে চলব। তুই বিয়ে করার আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলি না। এখন এসেছি লন্ডনে চলে যাওয়ার খবর দিতে। চিরিতই জানতে পারতিস।'

হঠাৎ মা বললেন, 'এখন আফসোস করছ কেন?'

অন্নদা মুখার্জী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মা বললেন, 'ওর দশ বছর বয়স থেকে আমি যখন বলতে শুরু করেছিলাম যেমতের প্রশ্ন দিয়ে না তখন কানে তোলেনি। তুমিই ওকে আশ্চর্য্য দিয়ে মাখায় তুলেছ। পাঁচজনের অপত্তি গ্রাস্ত্য করানি। অতখানি স্বাধীনতা দিলে পরিণতি এই হবেই। এখন আফসোস করে কোনও লাভ নেই। ও যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ভাল থাকে থাকুক। আমাদের কিছু বলার নেই।'

'তার স্বামীও লন্ডনে যাচ্ছে?'

'না। ওকে এখানে কাগজ চালাতে হবে।'

'দুজনে দুদশে থাকলে সম্পর্ক থাকবে?'

সন্তবত থাকবে না।

'সে কি রে।'

'বাস্তবকে মেনে নিতে হবে বাবা।'

হঠাৎ গলার স্বর পাশটে ফেললেন অন্নদা মুখার্জী, তুমি কি আজই ফিরে যাবে?'

'এখন মনে হচ্ছে আমি থাকলে তোমাদের অস্বস্তি বাড়বে।'

'আমাদের স্বস্তি নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। একটা রাত থেকে যাও।'

যে বাড়িতে শৈশব কৈশোর কেটেছে, যার প্রতিটি কোণে কত স্মৃতি ছড়ানো সেই বাড়িতে

একটা রাত থাকার সময় নিজেকে বিদেশি মনে হওয়া যে স্বাভাবিক হতে পারে তা কখনও ধারণা

ছিল না মোহরের। মা চুপচাপ আছেন, মেয়ে যে নষ্ট হয়ে গেছে সে ব্যাপারে যেন কোনও পদক্ষেপ

নেই। স্কুলে ফুটবল ম্যাচ থাকলে মা ঠিক এই রকম ব্যবহার তার সঙ্গ করতেন। মানুষের বয়স

বেড়ে গেলেও কোনও কোনও আচরণের বদল হয় না।

বাবা গভীর। অবশ্য ডাইভারের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অনেক অনেক দিন বাসে খাওয়ার

ঠেবিলে একসঙ্গে খেতে বসেছিল ওরা। আচমকা চেনা রান্নার স্বাদ, গন্ধ, দারুণ পুলকিত

করেছিল মোহরকে। সে অঙ্ককার ঘরে বসে ওই রান্না খেলে বলে দিতে পারবে মা রেখেছে।

এইভাবে অতীতের কাছে চলে যাওয়া যায়। এইসব সস্তু কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু

মানুষের সম্পর্কে যদি জং ধরে তাহলে তার মেরামতির কায়না তার জন্যে নেই।

রোদ পড়লে মোহর অন্নদা মুখার্জীকে বলল, 'একটু ঘুরে আসি।'

অন্নদা মুখার্জী বাইরের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন, মাথা নাড়লেন নিশ্চন্দে।

গাড়ি নিল না মোহর। রাস্তায় পা দিয়ে আগের মত স্বাভাবিক ছন্দে হাঁটতে দিয়ে সে লক্ষ্য

করল সবাই তাকে দেখছে। ভাক শুনেন জ্বালায় এসে সবিশুয়ে তাকে চাচ্ছে অনেক।

হলদুপুরের মেয়ের এমন অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না। সে সালোয়ার ফর্মজ পরেছিল আজ। এই

পোশাকে তাকে মন্দ লাগে না।

ক্রমশ মানুষের বিমিত্র দৃষ্টি থেকে সে উপেক্ষা করতে শিখে গেল। সোজা চলে এল ধ্যানদার

কাছে। বাড়ির লাগোয়া আখড়াতে তখন জুজো চর্চা চলছে। এতগুলো বছরে একটুও বদলায়নি

জায়গাটা। ধান্দা একজনকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বুক সাপা হয়েচে, শরীর রোগা। তাকে দেখতে

পেয়ে খুব অবাক হলেন এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন, 'তুই? কবে এলি?'

'আজ।' হঠাৎ কি হচ্ছে হল ঝুকে প্রশ্নাম করল মোহর।

'তার এইসব দোষ তো আগে ছিল না।' ধান্দা হাসলেন।

'কেমন আছেন?'

'ভাল। এখন ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। ওই যে ছেলোটো, ওর নাম মালিক, এবার অলবেসল

রানার্স হয়েছে। তাকে নিয়ে প্রশংসার গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

মোহর চুপচাপ মাথা নাড়ল। হঠাৎ তার কষ্ট হচ্ছিল। কেন হচ্ছিল সেটা সে জানে না।

'তুই তো এখন নামকরা লেখক। একটা দুটো লেখা পড়েছি আমি।'

'আমি তো গল্প-উপন্যাস লিখতে পারি না।'

'কি দরকার? তুই যেটা দপ্তর তাই লিখবি। মানুষের চোখ ফোটানো খুব দুরূহ ব্যাপার।

কারণ, প্রকৃতি মানুষকে যে দৃষ্টিদান করে তার বাইরে সে সহজ যেতে চায় না।'

'ধান্দা, আমি যে জুজো ছেড়ে দিয়েছি আপনাকে কিছু না বলে তাতে আপনি রেগে যাননি?'

‘না। ভূই যেটুকু শিখেছিলি সেটুকুই তোর দরকার ছিল। ভূই যদি না ছাড়তিস তাহলে আজ বিখ্যাত হতে পারতিস না।’

‘ধ্যানদা, আপনি কি জানেন আমার প্রথম বিয়ে টেকেনি? আমি দ্বিতীয়বার যাকে বিয়ে করেছিলাম তার সঙ্গেও বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে।’

‘এগুলো তো আনন্দের খবর নয়। আবার লোকলজ্জার জন্যে যদি বিচ্ছিন্ন না হতিস তাহলে তোকেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। বাইরে থেকে আমি কি করে বুঝব তোর সমস্যা কি ছিল?’

‘আমি লন্ডনে চলে যাচ্ছি ধ্যানদা। ওখানে চাকরি পেয়েছি।’

‘গুড! আমি তো একটা জায়গায় আটকে থাকলাম কিন্তু তোদের উন্নতির কথা শুনে ভাল লাগে। উপন্যাসকে তোর মনে আছে? তোর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই উপন্যাস এখন পুলিশ সার্জেন্ট। সেদিন এসে দেখা করে গেল। এখনও চেহারা ঠিক রেখেছে।’ ধ্যানদা হাসলেন।

‘প্রাণেশ কেমন আছে?’

‘প্রাণেশ? ও, গুর কথা বলিস না। ও নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘কি রকম?’

‘প্রথম প্রথম স্মাগলিং করত। প্রচুর টাকা অন্যায্যভাবে রোজগার করে উড়িয়েছে। মদ খেয়ে থাকত দিন রাত। অন্যসব দোষও ছিল। পুলিশ ওকে ধরে। তিন বছর জেল খাটে। এখন শরীর ভেঙে গেছে। খুব অর্ধাভাবে আছে শুনেছি।’

‘ও কোথায় আছে?’

‘দের পুরনো বাড়িতে। আত্মীয়স্বজন কেউ সঙ্গে থাকে না। এক বুড়ি পিসি এখনও আছে। তা ওর কথা এত জিজ্ঞাসা করছিস কেন?’

‘আমি গুর কথা লিখতে চাই। এক সময় আপনার ভাল ছাত্র ছিল, আজ কোথায়!’

‘লিখলে সত্যি কথা লিখিস। আমি নিজেও ওকে বুঝতে পারি না। সবাই ঘেঁষা করে অথচ আমি মুখে বললেও সেটা মনে আনতে পারি না।’

প্রাণেশের বাড়িতে কখনও যায়নি মোহর। ধ্যানদা একটু ছেলেকে সঙ্গে দিলেন। সে আধ মাইল হেঁটে প্রাণেশের বাড়ি চিনিয়ে দিল। বাইরে থেকেই বোঝা যায় বাড়ির মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা। পলস্তাররা খসে গেছে, কোথাও হুঁটও। ছেলটিকে বিদায় করে মোহর দরজার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে সাড়া এল। দরজা খুলল যে সে যেন অনেকদিন বাে অবাে হল। তার চেয়ে কম হয়নি মোহর। রোগা লিক লিকে প্রাণেশের অতীতের ছায়াও নেই। চোয়াল বসে গেছে, উঠেছে মাথার চুলও।

‘প্রাণেশ? আমি মোহর।’

‘ও, হ্যাঁ। কি ব্যাপার?’

‘তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।’

‘কেন?’

‘তোর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে না?’

‘গাওন্দারারা আসে।’

‘আমাকে চিনতে পারছিস?’

‘হ্যাঁ। দশটা টাকা দিবি? অন্তত পাঁচ?’

‘কি করবি?’

‘বুড়িটাকে দেব চাল আনতে আর মাল খাব। প্রাণেশ হাসল, ‘পুরনো বন্ধু ভূই, তাই সত্যি কথা বললাম। আজকাল আমার কোনও রোজগার নেই।’

‘তোর এই অবস্থা হল কি করে?’

জবাবে শুধু ঠোট ঝটল প্রাণেশ। সোজা হয়ে দাঁড়তে পারছিলেন না সে। মোহর ব্যাগ খুলল। অনেক বেশি টাকা সে দিতে পারে প্রাণেশকে কিন্তু তার খুব রাগা ছিল। হাইওয়ের পাশে নির্জনে যে প্রাণেশ তার পিঠে ছুরি ছুরি ঠেকিয়ে জামা খুলতে বাধ্য করেছিল এবং তারপর যে কখনও সামনে আসেনি সে ইলেকট্রিক স্মৃতিতে বোঝাবে এতদিন বেঁচেছিল তা চুরমার করে দেবার জন্যে এই রুগন মানুষটার ওপর খুব রাগা ছিল। দশ টাকার নোট বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘ভূই চিকিৎসা করাস না?’

‘ফোটা! অসুখ সারবে না। আর সারলে কি লাভ। কোনও শালা আমাকে ভয় পাবে না, মাল দেবে না। একটা ভাল মেয়েহলে যে আমি পাব না। আলুভাত খাওয়ার জন্যে প্রাণেশ বেঁচে থাকতে চায় না।’ সে।

দশ টাকা দিয়ে চুপচাপ রাস্তায় নেমে পড়ল মোহর। এবং তখনই তার রঞ্জনার কথা মনে এল। রঞ্জনার বাবা প্রাণেশকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। যে কোনও বাবাই মেয়ের নিরাপত্তা দেখতে চায়। রঞ্জনা এখন কোথায়? ওদের বাড়িতে গলে কেমন হয়?

এখন প্রায় সন্ধ্যা। রঞ্জনার বাবা এবং মা সেই আগের মত বাড়ির বাগানশায় বসেছিলেন। অপ্রলোক বললেন, ‘আপনি?’

‘আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি মোহর, রঞ্জনার সঙ্গে পড়তাম।’

‘ওহো! এসো এসো। তুমি তো এখন খুব বিখ্যাত হয়েছো। ভারতজোড়া নাম। কিন্তু তোমাকে দেখলে ভয় করে, বাড়িতে আবার বিপ্লবের বীজ না বুনে যাও?’ রঞ্জনার বাবা নিজেই হাসলেন।

উপেক্ষা করল মোহর, ‘রঞ্জনার খবর কি?’

‘একটু আগে ডাক্তারের কাছে গেল। নন্দিনীকে চেনো। ওদের সঙ্গে পড়ত। সে তো এখন হলুদপুরে ডাক্তারি করছে। খুব ভাল প্র্যাকটিস। রঞ্জনা ওর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে দেখাতে।’

নন্দিনী যে হলুদপুরেই ডাক্তারি করছে তা জানত না মোহর। তার চেয়ে অবাক রুগন রঞ্জনার মেয়ে হয়েছে। তার মানে বিয়েধা করে এখন সন্ন্যাসী সে।

‘বোসো না। বন্ধ্যাধানের মধ্যে এসে যাবে।’ বাবা বললেন, ‘তুমি তো ইংরেজি কাগজে আছ?’

‘হিলাম। লন্ডনে চলে যাচ্ছি।’

রঞ্জনার মা বললেন, ‘সেই ভাল। তুমি যা লেখ তা সাহেবদের ভাল লাগবে।’

কথা বাড়াত বয়স কম থাকলে। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘নন্দিনীর চেম্বার কোথায়?’

‘কালীমন্দিরের পাশে।’

‘আমি এলাম।’ মোহর হাঁটতে শুরু করল।

নন্দিনীর চেম্বার বুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। এর মধ্যে অনেক পোস্টেন্ট এসে গেছে। হলুদপুরের একমাত্র মহিলা ডাক্তার হিসেবে নন্দিনী যে জনপ্রিয় তা বোঝা যাচ্ছে। এত বছর পরেও যাকাল কোলে নিয়ে বসে রঞ্জনাকে চিনতে অসুবিধে হল না। রঞ্জনা মোটা এবং আরও ফর্সা হয়েছে। সুখী গৃহিণীর ছাপ সর্বত্র। অন্য মহিলাদের বিশ্মিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সে রঞ্জনার সামনে দাঁড়াল, ‘ভাল আছিস?’

রঞ্জনা অবাক হয়ে দেখল, ‘বাবা! চিনতেই পারিনি!’

‘কেন?’

‘তোকে এ পোশাকে কখনও দেখিনি। ভূই তো এখন বিখ্যাত মানুষ।’ রঞ্জনা হাসল, ‘মোহর মুখাঞ্জির সঙ্গে আলাপ আছে বলল কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কতী, খুব ভাল মানুষ, সে-ও বলে সত্যি তোমারা বন্ধু ছিলে।’

‘ভূই কতী বলিস মুখি?’

‘যা মুখে আসে তাই বলি। এই যে এখন বাবার কাছে এসেছি তাতে ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রোজ ফেন! বিল তো আমাদেরই দিতে হবে।’

‘নন্দিনী ভেতর আছে?’

‘হ্যাঁ। খুব ঢাকা কামাচ্ছে। বিয়েধা করেনি তো? হ্যাঁরে, তুই দুবার বিয়ে করেছিস?’

দুবার বিয়ে করা মহিলাকে দেখার জন্যে সবকটা চোখ এখন এদিকে। রঞ্জনর গলার স্মরণ সবাই শুনতে পেয়েছে। মোহর হাসল, ‘হ্যাঁ’। তুই আর কিছু বলবি?’

এই সময় নন্দিনী চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। চেয়ারা একই রকম রয়েছে। তবে ব্যক্তিত্ব এসেছে মুখে। হেসে বলল, ‘কি খবর? আজ এসেছি? থাকছে তো? তাহলে রাত্রে চেম্বার সেরে তোমাদের বাড়ি যাব। তখন কণা বলা যাবে।’

‘বেশ। চলি রঞ্জন।’ বেরিয়ে এল মোহর। নন্দিনীর কথা বলার ধরন এবং সে যে এখন পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এটা বুঝিয়ে দেওয়া খুব ভাল লাগল মোহরের। এ সময় নন্দিনী যদি পেশেন্টদের ফেলে রেখে তার সঙ্গে গল্প জুড়াত তাহলে নিশ্চয়ই অন্যায় করত।

রাত দশটার কিছু আগে নন্দিনী এল। তাকে দেখে বাবা এবং মা যে খুব খুশি তা বুঝতে পারলিখি মোহর। ওদের সঙ্গে কথা শেষ করে নন্দিনী জিজ্ঞাসা করল, ‘এবার বোলা, কি খবর?’

মা উঠে চলে গেলেন ভেতরে, বাবাও।

মোহর হাসল, ‘ভালই। তুমি তো এখানে চমৎকার প্রাকটিশ করছ।’

‘ঘরের মেয়ে বলেই—’

‘বিয়ে করবে না?’

‘আমার যা চেয়ারা তাতে কোনও ছেলের বাবা-মা পছন্দ করবে না। কোনও ছেলে এগিয়ে এসে প্রেম নিবেদন করেনি বলে সেটা করা হয়নি। অনেকের তো অনেক কিছু হয় না।’ নন্দিনী হাসল, ‘তোমাকে আমি লেখালেখি করতে বলেছিলাম একসময়, মনে আরত?’

‘আছে। আমার লেখা তুমি পড়?’

‘প্রথম প্রথম পড়তাম। তোমাকেও চিঠি দিয়েছিলাম। এখন পড়ি না।’

‘কেন?’

‘পছন্দ হয় না। মনে হয় তুমি প্রচার চাইছ। বাস্তবকে উপেক্ষা করে লিখছ। যাঁরা তোমার পাঠক তারা তোমাকে আর পছন্দ করছে না। যাদের জন্যে কলম ধরেছিল তারা তোমাকে সহ্য করছে না। কেউ একথা তোমাকে বলে কিনা আমি জানি না। কলকাতার কিছু বিখ্যাত চিত্রপটচালক আছেন, যাদের খ্যাতি ফিশন ফেক্টিভালগুলোতে অথচ বাংলা ভাষায় ছবি করলেও তাদের ছবি বাঙালি দেখতে চায় না বলে হলে রিলিজ করে না। তুমি সেই পর্যায়ে চলে গিয়েছ।’

‘আমি যা লিখছি তা কি মিথ্যে?’

‘না। তুমি কম্পিউত সত্যকে হাতিয়ার করলে। মানুষের যেকোনও আচরণের অনেকগুলো শেড থাকে। তুমি একটাকে তুলে ধরে অন্যগুলোকে অস্বীকার করছ। তোমার নায়িকা ফুলশময়ার রাতে দরজা খুলে স্বামীর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে কিন্তু সেটাই এদেশের একমাত্র করণীয় নয়। ভারতবর্ষের অনেক শ্রেণীর মানুষ মনে করে ফুলশময়ার রাতে স্বামী যদি স্ত্রীকে না ব্যবহার করে তাহলে বিবাহ সুখের হয় না। সেসবক ক্ষেত্রে স্ত্রী হতাশায় কেঁদে ভাসায়। তার কথা তার মত করে তোমার কলমে তো কখনও লেখা হয়নি?’

‘তুমি ওটা সমর্থন কর?’

‘আমার সমর্থন নিয়ে তাদের কিছু যায় আসে না। মালদার একটি গ্রামের মানুষকে দিয়ে তুমি বাগবাছারের ভাষা হাজার চেষ্টা করে কয়কবার বলতে পারা কিন্তু গ্রামে ফিরে নিজের মানুষদের সঙ্গে সে নিজের ভাষায় কথা বলবেই। এটাই স্বাভাবিক। তুমি ভুল বলে কেউ মানবে কেন?’

‘চমৎকার। এই ভাবে তোমরা একটা অন্যায়কে প্রশংসা দিয়ে যাচ্ছ।’

‘ন্যায় অন্যায় ব্যাপারটা কোন নিরিখে মাপবে। যা সত্যিকারের অন্যায় তা আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেই আমি ডাক্তারি করছি কিন্তু যে কোনও বাইরের কাজ পায়নি সে যদি সৎসারের কাজগুলো করে তাকে তুমি ব্যঙ্গ করতে পার না।’ নন্দিনী হাসল, ‘ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝগড়া করব। করে ফেললাম। তুমি এখন প্রচুর নাম করছে। সেইসঙ্গে টাকাও। তোমার উদ্দেশ্য সফল?’

‘মানে বুঝলাম না।’

‘সেনি একটা কাগজে পড়ছিলাম ফেক্টিভাল ফিশনের পরিচালকরা ভারতবর্ষের গরিব নিম্নশ্রম মানুষদের গল্প ছবি করতে পছন্দ করে কারণ সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে খুব চলে। দারিদ্র্য খুব ভাল এরপোর্ট আর্টস্টেম। আমাদের দেশে এখন মেয়েদের হয়ে ডেসপার্টে কথা বললে বই ভাল চলে, অগ্রে সহানুভূতির সঙ্গে বললে চলত। যাক, কদিন আছে?’

‘কাল চলে যাবে।’ মোহরের আর ভাল লাগছিল না।

‘মোহরশাহী মাসিয়ার কথা একটু খেয়ালে রেখো। খুব ডিপ্রেসনে ভুগছেন ওঁরা। চলি।’

নন্দিনী চলে গেল। মোহরের মনে হল বিয়েধা না করলে মেয়েদের মন একপেশে হয়ে যায়। কারণ ও ভাল সহজমানে নিতে পারে না।

রায়ের খাওয়া চুক গেলে শুয়ে পড়ছিল মোহর। ঘরের আলো নেভানো ছিল। শুয়েছিল কিন্তু ঘুম আসছিল না। নন্দিনী অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে কিন্তু ওর বলার সহজ ভঙ্গিমা এখন মন জ্বালাচ্ছে। না, আমি ঠিক করছি। যা ভেবেছি তাই লিখছি। দীপ্তর পরিবার মনে নিয়ে ওর সম্ভানকে পৃথিবীতে এনে যদি ওখানেই থেকে যেতাম তাহলে মানুষ হিসেবে আমার কোনও সম্পদ থাকত না। এইভাবেই যে বাবার লক্ষ লক্ষ মেয়ে মরে বেঁচে আছে তা নন্দিনীদের বোঝানো যাবে না। রবিনকে আমি ব্যবহার করিনি। ওকে আমার ভাল লগেছিল। বরণ বলা যেতে পারে ওই আমাকে ব্যবহার করেছে। আমি শহরে না থাকলে ও অন্য মেয়েদের সম্ভান করেছে। তাই ওকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। এই রবিনের সম্ভান যদি পৃথিবীতে আসত তাহলে জীবন জটিল হয়ে যেত। অতএব আমি ভুল করিনি।

হঠাৎ শরজায় শব্দ হল। অমদা মুখার্জির গলা অন্ধকারে বাজল, ‘দুমিয়ে পড়েছিস?’

‘না। কিছু বলবে?’ মোহর উঠল না।

‘তোর জন্যে খুব চিন্তা হয় মা?’

‘কেন? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি বাবা।’

‘জানি না। কিন্তু এত অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে কোনও কিছুর সঙ্গে তুই মানাতে পারবি না। তোরও তো ব্যবস বাড়ছে। তুই যা লিখিস তা কি সত্যিই বিশ্বাস করিস?’

‘হ্যাঁ বাবা, করি।’

‘হুম।’ অমদা মুখার্জি দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। মোহর উঠল। কাছে এসে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে, ‘বাবা, আমার জন্যে তুমি এত চিন্তা কোরো না।’

অমদা মুখার্জি কোনও কথা বললেন না।

এখন শুয়ে নেবার সময়। কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলে অনেকগুলো কাজ শেষ করতে হবে। প্রকাশকদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থায় আসতে হবে। নিজের যেসব জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না সেগুলো কোনও অন্য আশ্রয়ে দিয়ে দেবে। মোহর খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। এখন রবিন এই ফ্ল্যাটে কমাটিং আছে। এলে দু-একটা কথা বলে ফিরে যায় নিজের বাড়িতে। ভিত্তিভারের জন্যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুজনই সম্মত বলে সেটা পেতে অসুবিধে হবে না বলে মোহরের উকিল জানিয়েছেন। ইদানীং রবিন খুব অনুভূত ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে।

কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিল প্রকাশকের কাছে। সে ভারতবর্ষে না থাকলে টাকা কোন অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে সেই ব্যবস্থা করে বেরিয়েছিল এই সময় স্টুডেন্টস হলের দরজায় ফেঁদুনিটা চোখে পড়ল। কোনও একটি লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোগে কবিসম্মেলন হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন দীপ্তর সঙ্গ এককম সম্মেলনে টাইটল করে খুরে বেরিয়েছে সে। এখন—

মোহর গেটে দাঁড়াতেই মাইকে দীপ্তর গলা শুনতে পেল। ডায়াসে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ছে। আর একটু এগিয়ে মনে হল বেশ রোমাংস হয়ে গেছে দীপ্ত। ওর চোখ বন্ধ করে কবিতা বলা, পাঞ্জাবির আন্তিন গোটানো, কপালে পরে থাকা রক্ত চুল আচমকা নাড়িয়ে দিল মোহরকে। তার এই বয়স পর্যন্ত যে জীবন সেই জীবনে দীপ্তই ছিল একমাত্র পুরুষ যে চাইলে একসময় পৃথিবীটা দিয়ে দিতে পারত। প্রাণেশ আচমকা তার দরজা খুলে দিল, কিন্তু ওই পর্যন্ত। রবিনের হাত ধরে সে বাহারি পোশাকে সেজে বেরিয়েছে কিন্তু দীপ্ত তাকে আটপৌরের আরাম দিয়েছিল শোওয়ার ঘরে। সেইসব মুহূর্তগুলো কি সুখের ছিল। কবিতা পড়ে ডায়াস থেকে নামতে কিছু হাততালি পড়ল। আর একজন কবি উঠে যেতে দীপ্ত এগিয়ে যাচ্ছিল চেয়ারের দিকে। মোহর দ্রুত তার কাছে পৌছে গেল, 'কেমন আছ দীপ্ত?'

দীপ্ত অবাক। কিন্তু তার মুখে কৃত্রিম ছাপ দেখতে পেল মোহর। দীপ্ত বলল, 'আছি।'

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আসবে?'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানে।'

'ঠিক আছে। ভেবে দেখব।'

'না কোনও ভাবনা নয়। এখনই চলে।'

'এখন কি করে যাব? অনুষ্ঠান চলছে।'

'এখন অনুষ্ঠান আরও হবে কিন্তু তখন আমি এদেশে থাকব না।'

দীপ্ত অসহায় ভঙ্গিতে তার বন্ধুদের দিকে তাকাল। তারাও এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। মোহরের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্য্ত্তান্ত তাদেরও জানা। ওদের চোখে অপছন্দ শব্দটাকে ধরতে পারল মোহর। পড়ে মরিয়া হল, 'চলো, প্লিজ। আমি তোমাকে আর কখনও অনুশ্রাব্য করব না।'

যিনি কবিতা পড়তে উঠেছিলেন তিনি ডায়াসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ছোট্ট হলঘরে কেউ কথা বললে যে অসুবিধা হয় তা তাঁর ভঙ্গিতে স্পষ্ট। দর্শকদের একজন বলে উঠল, 'বাইরে গিয়ে কথা বলুন না।'

দীপ্ত তার বন্ধুদের বলল, 'আসছি।'

'কতক্ষণ?'

'এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।'

মোহর দীপ্তকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তার স্বাভাবিক এবং ঔজ্জ্বল্যের পাশাপাশি দীপ্তকে অনেক রূপগ এবং নিশ্চয় দেখাচ্ছে। পাড়ির দরজা খুলে মোহর বলল, 'ওঠো।'

'কোথায় যাব?'

'আজ আমি যা বলব তাই তুমি শুনবে।'

'আমি কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

'দেখা যাবে।'

পাশাপাশি বসে ইচ্ছেসঙ্গেও কথা বলল না মোহর। ড্রাইভার তার যে চেহারা জানে তা পাশ্চাত্যে চাইল না সে। একসময় দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমার ফ্ল্যাটে।'

ফ্ল্যাটে ঢুকে দীপ্ত বলল, 'ভালই আছে। নিজের ফ্ল্যাট?'

'না। আগের অফিস থেকে পেয়েছিলাম।'

'আগের অফিস মানে?'

'আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। বিদেশের একটা কাগজে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।' ইংরেজিতে লিখবে?'

'প্রথম প্রথম একজন অনুবাদ করে দিত। লেগে থাকলে সব কিছু হয়। এখন নিজেই লিখি। এসব কথা থাক। কি খাবেন বলে। হুইস্কি?'

'তোমার ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই?'

'না। সকালে একজন আসে ক্রিন করতে, ব্যাস।'

'তোমার বর্তমান স্বামী?'

'আমরা আলাদা থাকি।' মোহর বিরক্ত হচ্ছিল, 'ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলো এখানেই শেষ হোক।'

সোফায় বসে দীপ্ত বলল, 'আমি আজকাল মদ খাচ্ছি না।'

'মাই গড? কেন? চোখ বড় করল মোহর।'

'পেটে ব্যথা হয়।'

'লিভার?'

মাথা নাড়ল দীপ্ত, হ্যাঁ। মোহর ওর চেহারাটা আবার দেখল, 'ওষুধ খাচ্ছে?'

'ওই আর কি?'

'চাকরিটা আছে তো?'

'গেলে খাব কি? বাড়িতে আর একজন তো রয়েছে।'

'একজন কেন?'

'বোন তার বিয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আবার ব্যক্তিগত কথা এসে যাচ্ছে। জল খাব।'

মোহর এক গ্লাস জল এনে দিল। দীপ্ত গ্লাস ফেরত দিতে বলল, 'তুমি ওঠ। একটু রেস্ট নিয়ে চল।'

'ঠিক আছে।'

'একদম ঠিক নেই।'

শোওয়ার ঘরে নিয়ে এসে পাশের দরজাটা খুলে দিল মোহর, 'ভেতরে যাও? স্নান করে ফেল। আমি পাছমা দিচ্ছি। তাই পরে একটু শুয়ে থাকো। আমি খাবার বানাই।'

'তুমি খাবার বানাবে?'

'আমার মত করে। যাও, কথা বাড়িয়ে না।' প্রায় জোর করে দীপ্তকে বাধকমে ঢুকিয়ে দিয়ে সে ওয়াশরোব থেকে একটা পাছমা বের করল। তার নিজের পাছমা, কিন্তু দীপ্তর হয়ে যাবে। দরজায় নক করে বলল, 'পাছমামা বাইরে হইল।' তারপর স্টিরিওতে সুমনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যান্ডে চাליয়ে দিয়ে কিতেনে চলে এল। বারোশো স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাট সুমনের গলা অদ্ভুত আমেজ তৈরি করছে। টোপীয়ে পিউজ্জিট চাপিয়ে কর্নফ্রেকস তৈরি করতে শুরু করল সে। এই সময়টা তার খুব ভাল লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল ঠিক এইরকম একটা জীবন সে চেয়েছিল। খুব অল্প চাওয়া অথচ অস্পষ্টকৃষ্ণ পাওয়া হল না। আচ্ছা, আজ যদি দীপ্ত ফিরে না যায়, আজ, কাল, এবং চিরটা কাল যদি এই ফ্ল্যাটে তার কাছে থাকে তাহলে? তাহলে সে কোথাও যাবে না, লন্ডনে তো নয়।

বাওয়ার টেবিলে বসে মোহর বলল, 'তোমার লিভারের জন্যে এই মেনু ভাল।'

কর্নফ্রেকসে চামচ দিয়ে দীপ্ত বলল, 'আমার খারাপ লাগছে না। প্রথম তোমার রান্না খাচ্ছি।'

'পাঞ্জাবিটা পরে খাও কেন?'

'লভার পেজি পরি না তা তুমি জ্বলে গেছ।'

‘খালি গায়ে থাকতে। কে দেখতে আসছে?’

‘চারধারে যে সাহেবি ব্যবস্থা, খালি গা নমাবে?’

‘খুব যানাবে। খোলা, দাঁড়াও আমি খুলে দিচ্ছি।’

কিন্তু দীপ্ত নিজেই বুলল। সযত্নে পাঞ্জাবিটাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে হ্যাঙ্কারে খুলিয়ে দিল মোহর। অনেককাল পরে নাকে সেই চেনা গন্ধ এল। ফিরে এল খাওয়ার টেবিলে। পেছন থেকে দীপ্তর পিঠি দেখে মনে হচ্ছিল বেচারার ওপর অনেক ধকল গেছে। সামনে বসে বৃক্কের পাঞ্জর দেখতে পেল। কিরকম মায়া ছড়িয়ে পড়ল মনে।

খাওয়া শেষ করে শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দীপ্তকে জড়িয়ে ধরল। দীপ্ত বলল, ‘এসব কেন?’

‘আমার ভাল লাগছে, তাই।’

‘তুমি অদ্ভুত।’

‘আমাকে তোমার খারাপ লাগছে?’

‘লাগলে কি এখানে আসতাম?’

‘তুমি তো মাত্র একঘণ্টার জন্যে এসেছিলে।’

আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে মোহর অপলক তাকিয়েছিল। দীপ্ত এখন শিশুর মত ঘুমাস্থে তার বিছানায়। এর মুখে যতই ক্লান্তির ছাপ থাকে এখন এই মুহূর্তে তৃপ্তির আলো মাখামাখি। মোহর নিজে কি তৃপ্ত? এত অস্পষ্ট, এত সহজ কি মানুষ তৃপ্ত হয়? এইভাবে গোটা জীবন যদি কাটিয়ে দেওয়া যেত! দীপ্তর মধ্যে যে তেজ ছিল সেটাকে যদি আবার জাগিয়ে দেওয়া যেত। মোহর জানে সঙ্গে থাকলে সে পারবেই। এই সময় বেল বাজল।

শব্দটা সমস্ত ফ্ল্যাট কাঁপানো। দ্বিতীয়বার বাজলে হয়তো দীপ্তর ঘুম ভেঙে যাবে। তাড়াতাড়ি নিজেই জড়িয়ে খাট থেকে নেমে দরজায় চলে এল মোহর। চেনটা লাগিয়ে নব খোরাল কে! দরজার ওপাশে এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে রবিনকে চিনতে অসুবিধে হল না।

রবিন বলল, ‘খোল!’

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয়ে গেল মোহর, ‘ঘরে লোক আছে।’

‘মানে?’ উকি মেরে দেখতে চাইল রবিন। সেই সময় দীপ্ত খালি গায়ে উঠে এসেছে। তাকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত রবিন মোহরের দিকে তাকাতোই মোহর বলল, ‘আমার প্রথম স্বামী!’

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা অদৃশ্য হল। জুতারে শব্দ দ্রুত নেমে যেতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা বন্ধ করে দিলো মোহর। দিয়ে বলল, ‘রবিন!’

‘তোমার স্বামী?’

‘ছিলো। আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি।’

‘সে কি?’

‘মেলাতে পারলাম না। সবাই পারে না। তুমি উঠে এলে কেন?’

‘ঘুম ভেঙে গেল। কটা বাজে, এবার যেতে হবে।’

‘যাবে মানে? এখন কত রাত তুমি জানো? বিদে পেয়েছে?’

‘অ পেয়েছে। কিন্তু আমার কি থাকা উচিত হবে?’

‘আর কতকাল উচিত অনুচিতের টানাপোড়নে থাকবে। তুমি টিভিটা খুলে বোসো, আমি ডিনার রেডি করি।’ কাছে গিয়ে দীপ্তর ঠোঁটে আলতো চুমু খেল মোহর।

এক ঘণ্টার জন্যে এসেছিল কিন্তু দেখতে দেখতে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে মোহর তাকে দুহাতে আগাল রেখেছে। দ্বিতীয় দিনে তার শরীরের অবস্থা দেখে তাকে শারীরিক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কিন্তু দীপ্ত ইপিগিয়ে উঠেছিল। এই বন্ধ ফ্ল্যাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত সে বলল, ‘এবার যেতে দাও।’

‘আমার কাছে থাকতে আর ভাল লাগছে না?’

‘তা নয়। কিন্তু কেন থাকবে?’

‘আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?’

‘শুধু ভাল লাগার জন্যে এভাবে থাকা যায় না। ভেতরের জীবনের পাশাপাশি একটা বাইরের জীবন যে বড় প্রয়োজন।’

‘তোমার বাইরের জীবন মানে ওইসব কবিদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যাদের কোনও বেস নেই। যারা তোমাকে কিছুই দিতে পারবে না। ব্যর্থতা ছাড়া ওদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমার বাইরের জীবনের সঙ্গে এদের কোনও সংযোগ নেই। আমি কোনও পাটিতে গেলেও তার পেছনে কারণ থাকে।’

‘খুবই স্বাভাবিক।’

‘তাহলে?’

‘আমাকে যেতে দাও।’

‘তোমার খুব অহঙ্কার, না? নিজেকে খুব বড় কবি মনে করো?’

‘কবিদের তো অহঙ্কার থাকেই।’ দীপ্ত হাসল।

‘ওয়েল। তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তুমি আসতে পার দীপ্ত।’

দীপ্ত চলে গেল। হঠাৎ নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হল মোহরের। এই দুদিন ধরে এসব কেন করতে গেল সে? এই অপমানকে ডেকে আনার কি দরকার ছিল? এই দুদিন তার সঙ্গে একজন ক্রীতদাসীর কোনও তফাত ছিল না। যে সমস্ত নারী সারা জীবন স্বামীর সন্তোষের জন্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেন তাঁদের সঙ্গে তার কি পার্থক্য ছিল? অর্থাৎ সে যতই লিখুক বা বলুক তার ভেতরে ভেতরে একটা মন নির্লজ্জের মত রয়ে গেছে যে বলতে পারে আমি তোমাকে চাই যতক্ষণ তুমি আমাকে চাইছ। অর্থাৎ আমার চাওয়া শেষ হয়ে গেলেও আমি লেগে থাকব কারণ তুমি আমাকে চাইছ।

সারাতা দিন ছাঁকটিয়ে কাটাল মোহর। নিজের ওপর থেমা প্রবল হচ্ছিল। ক্রমশ সে নিজেইকে বিবাস করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল একা থাকলে সে ভয়ঙ্কর কাজটা করে ফেলবে। দীপ্তকে বলা দরকার এই দুটো দিনের স্মৃতি সে মুছে ফেলেছে।

গাড়ি নেই এখন। প্রায় রাত দশটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে গেল সে দীপ্তদের বাড়িতে। দরজায় তালা দেওয়া। বাড়িতে কেউ নেই। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক শব্দ পেয়ে এগিয়ে এলেন, ‘ও, অপসি! দীপ্ত খুব অসুস্থ। পিজিতে ভর্তি হয়েছে।’

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মোহর ‘কি হয়েছে?’

‘ঠিক জানি না। লিভারের ব্যাপার বলে শুনেছি।’

সোজা পিজিতে চলে এল মোহর ট্যাক্সিটা নিয়ে। দুই থেকে দেখতে পেল মোহরের মা আর দিদি সিঁড়িতে বসে আছেন। বানিকটা দুই দীপ্তর কবি বন্ধুরের দল। এরা সবাই রাত জাগছে। আচমকা মনে হল তার কিছু হলে, এভাবে হাসপাতালে ভর্তি হলে রাত জাগার জন্যে একজনও থাকবে না। কিরকম শির শির করতে লাগল।

‘দীপ্ত কি আপনার ওখানে ডিস্ক করেছিল?’

‘না।’ মাথা নড়ল মোহর।

‘কোনও অনিয়ম?’

উত্তর দিতে পারল না মোহর। অনিয়ম মানে কি? দীপ্ত তার বাড়িতে যে জীবন যাপন করে মোহরের কাছে আটচল্লিশ ঘণ্টা সেই জীবন যাপন করেনি। সেটা কি অনিয়ম। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে দীপ্তর।’

'লিভারের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক। ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছেন।'  
'কি আশ্চর্য! এটা কেমন করে হল?'  
'জানি না। কিন্তু আপনার গুণান থেকে ফিরে আসার পর হয়েছে। তাই আপনাকে গুরু মা দিদি ঠিক সন্তুষ্ট করতে পারবে না।'  
'আমাকে চলে যেতে বলছেন?'  
'সেটাই সবার পক্ষে ভাল হবে।'  
মোহরের ইচ্ছে হল নিষেধ না শুনতে। দীপ্তর মাকে গিয়ে বলতে, আপনার ছেলে আমার কাছে খুব যত্নে ছিল। কিন্তু মনে হল এ তো কৈফিয়ত দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কাকে কৈফিয়ত দেবে সে? কি জন্যে? ফিরে গেল মোহর।  
কলকাতার বাস চুকল। যাওয়ার দিন অম্মদা মুখার্জি এলেন। মোহর এটা আশা করেন।  
জিনিসপত্র যা ছিল সবই বিলিয়ে দিয়েছে মোহর। সাজানো ফ্ল্যাটে থাকার সুবিধে হল ব্যক্তিগত বইপত্র বা জামাকাপড় ছাড়া জিনিসের সংখ্যা বাড় না। দুপুরে অফিসে গিয়ে রবিনের সঙ্গে দেখা করেছে মোহর। রবিন গম্ভীর ছিল। ভদ্রভাবেই বলল, 'তুমি আরও সফল হও। কোর্টের কাগজপত্র পাওয়ায় আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব। ওখানে পৌঁছে টিকানাটা জানিয়ে।'  
মোহর সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কেমন লাগছে এখন?'  
রবিন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। উত্তর দিল না, একটু হাসল। মোহরের মনে হল, হাসিটার মানে ভাল, খুব ভাল লাগছে।  
মধ্য রাতের ফ্লাইট। অম্মদা মুখার্জি নিষেধ শুনলেন না। ট্যাক্সি নিয়ে মেয়েকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এলেন। মোহরের হঠাৎ মনে হল আজ সারাদিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনও কথাই হয়নি। ট্যাক্সির পেছনের আসনে ওরা সামান্য ব্যবধান রেখে পাশাপাশি বসে আছে।  
মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাতে তুমি কি করে ফিরবে?'  
'ফিরে তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বিমানবন্দরেই ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'  
'বাবা!'  
'বলো।'  
'আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি বলে তুমি কিছু মনে করছে?'  
'আমি কি কখনও তোমার কোনও কাজে বাধা দিয়েছি?'  
'দিতে ইচ্ছে করেনি?'  
'হ্যাঁ। করেছে। কিন্তু মনে হয়েছে যদি আমার বাধা দেবার কারণে তোমার কোনও ক্ষতি হয় তাহলে তার দায় বহন করার সাধ্য আমার নেই। তোমার জীবন, ভাল করলে তুমিই করবে, ঠিক করলে তোমারই ভাল। যতদিন নিজের পায়ের দাঁড়িয়েছ ততদিন আগলে রেখেছি। এখন তো তোমার ভালকন্ড বোধ তৈরি হয়ে গিয়েছে।'  
এয়ারপোর্টের আন্তর্জাতিক লাউঞ্জে জিনিসপত্র জমা করে আবার বেরিয়ে এল মোহর। বিশাল হলঘরের কোণে একটা চেয়ারে হাতের ওপর চিবুক রেখে অম্মদা মুখার্জি বসে আছেন। মেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে বলে সমস্ত অপছন্দ সত্ত্বেও এই যে এখানে এসে বসে আছেন তার যে ব্যাখ্যা সেটা যে কোনও সন্তানের সারা জীবনের সঙ্কট। মুখ নিচু করে বসে থাকা ছোট্টোকে কি রকম অসহায় দেখাচ্ছিল। কাছে চলে এল মোহর। মুখ তুললে অম্মদা মুখার্জি, 'সব হয়ে গেল?'  
'হ্যাঁ।'  
অম্মদা মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন। আচমকা একটা আবেগ এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে মোহর জ্ঞান হবার পর এই প্রথমবার বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হল। কান্না জড়ানো গলায় সে বকতে লাগল, 'বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাত অম্মদা মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালবাসা মানে বুঝিস?'  
আচমকা মেয়ের কান্না থেমে গেল। বাবার বুকে থেকে মুখ তুলে বলল, 'এতদিন বুঝতাম না।'  
'তাহলে আর কোনও ভয় নেই মা। তোর যখনই মনে হবে তুই চলে আসিস।'  
'বাবা, জানো, দীপ্ত এখন হাসপাতালে। ওর অবস্থা খুব খারাপ।'  
'জানি। তুই যখন দুপুরে বেরিয়েছিলি তখন টেলিফোন এসেছিল।'  
'কে করেছিল?'  
'নাম বলল সৌমিত্র।'  
'সৌমিত্র? কি বলল?'  
'ওই কথাই বলল।'  
'কিন্তু দীপ্ত নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। যাবে না বাবা?'  
'নিশ্চয়ই যাবে। তোর ফ্লাইটের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে।'  
'বাবা!'  
'আয় মা। গিয়েই চিঠি দিস।'  
মোহর অন্ধের মত হাঁটতে লাগল।

তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে প্লেনের সিটে শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল মোহর। হলদুপুর থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি-বোম্বে'র দ্বাণ নিয়ে লন্ডনে। না, আর ফিরে তাকানোর কোনও মনে হয় না। তাকে নতুন বিষয় ভাবতে হবে। মানুষের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সম্প্রসারণলোকে আবাত দেবার জন্যে অনেক অনেক লেখা লিখতে হবে। আর এর প্রতিটি লেখার চমক, প্রতিটি লেখার পেছনে তার দুঃসাহসের পরিচয় পেয়ে পৃথিবীর অনেক মানুষ স্তম্ভিত গাইবে। আর তার জন্যেই বেঁচে থাক। এই প্লেন লন্ডনে পৌঁছাবার আগেই দীপ্ত যদি পৃথিবী থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় তাহলে সে কি করতে পারে। বরং কখনও তো সে দীপ্তকেই তার লেখার বিষয়বস্তু করতে পারে। বিবাহিত জীবনে দীপ্ত কখনও তাকে বন্ধুত্ব দেয়নি।  
মোহর সোজা হয়ে বসল। জানলার বাইরে তাকাল। এতক্ষণে ভোর হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ আকাশে অন্ধকার। পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে প্লেন। রাতটা রাতই থেকে যাচ্ছে সেই কারণে। জন্মবার সময় যে মেয়ে কীদেদি, এখন এই এত অন্ধকার দেখে তার চোখে কান্না আসবে কেন?